273x210

প্রাক্তন ছাত্র সংসদের
উদ্যোগে

হীরক জয়ন্তী '৯৪

পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
বেলাব, নরসিংদী।

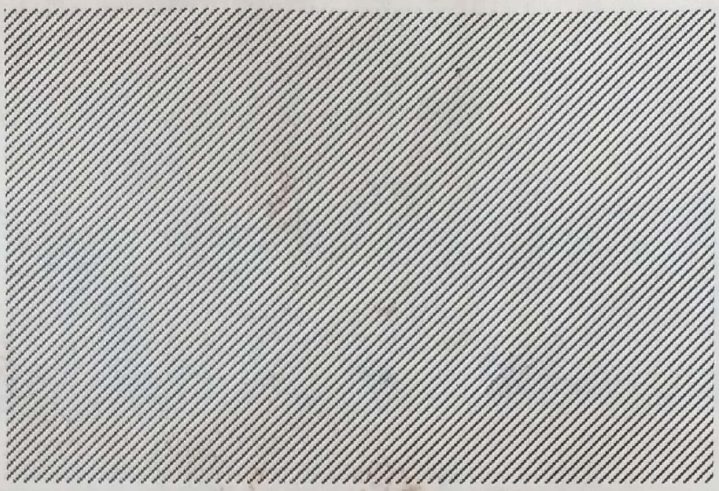

সম্পাদনা উপ—পরিষদ ঃ

মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া	—	আহবায়ক
মোঃ শহীদুল্লাহ ভূঁইয়া	—	সদস্য
আঁখি ভুষণ ভৌমিক	—	সদস্য
আনোয়ারা হোসেন	—	সদস্য
মোঃ নূরুল আমিন	—	সদস্য
মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক	—	সদস্য
আঃ ছাত্তার মোল্লা	—	সদস্য

সম্পাদনায় ঃ

মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

বাণী

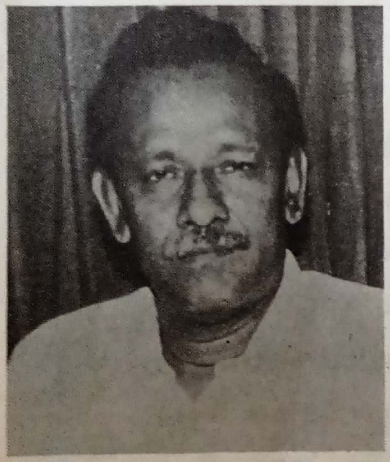

পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় নরসিংদী জেলার প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। এই অঞ্চলের জ্ঞানাগার হিসাবে এই বিদ্যালয়ের সুনাম সুবিদিত। আমি এই বিদ্যালয়ের ষাট বৎসর পূর্তিতে হীরক জয়ন্তী '৯৪ উৎসব পালন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। গ্রাম বাংলার মাটি ও সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য দরকার প্রকৃত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। বিদ্যালয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের কাজ হচ্ছে সুশিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়া। আমার বিশ্বাস এই বিদ্যালয় সে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

ষাট বৎসর পুর্তি একটি বিদ্যালয়ের জন্য এক বিরাট ঐতিহ্যের ব্যাপার। আমি হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সর্বাংগীন সাফল্য এবং বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।।

(আব্দুল মান্নান ভূইয়া)
মন্ত্রী
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নরসিংদী জেলার উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ষাট বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী '৯৪ পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র—শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী একটি জাতির চালিকা শক্তি। এই বিদ্যালয় যুগের পর যুগ শিক্ষার আলো বিস্তারে যে অগ্রণী ভূমিকা রেখে আসছে আগামী দিনেও তা অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। এমনি ভাবে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি নিজ নিজ এলাকার জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতে সক্ষম হয় তাহলে দু'হাজার সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার যে অঙ্গীকার আমাদের সরকার ঘোষণা করেছে তার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

আমি পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী '৯৪—এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(ডঃ আব্দুল মঈন খান, এম, পি,)
প্রতিমন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ষাট বছর পূর্তির এই মহান দিবসটিতে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সকল প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের, শিক্ষক মন্ডলী ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে। ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন এই বিদ্যাপীঠ পাঁচ যুগেরও অধিক সময় ধরে জ্ঞানের আলো বিস্তার করে আসছে এ এলাকাসহ আশে পাশের বিরাট এলাকা জুড়ে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠি একটি দেশের মুল্যবান সম্পদ। শিক্ষিত মানুষই একটি দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি। এই বিদ্যায়তন সৃষ্টি করেছে বহু কৃতি সন্তান। আগামী দিনে ও এই বিদ্যাপীঠ তৈরী করবে শিক্ষানুরাগী ও কৃতি ছাত্র ছাত্রী এই বিশ্বাস আমার আছে। আমি হীরক জয়ন্তী উৎসবের সাফল্য কামনা করছি।

২/৩/১৫

MP

সরদার সাখাওয়াৎ হোসেন বকুল
সংসদ সদস্য
বেলাব—মনোহরদী

শুভেচ্ছা বক্তব্য

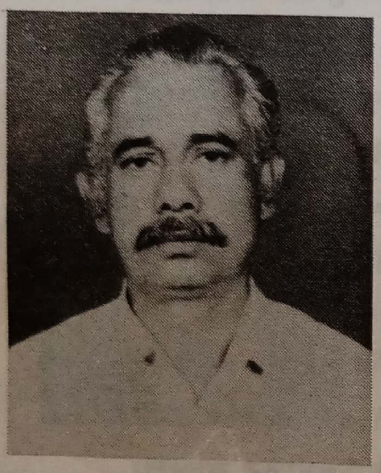

পোড়াদিয়া আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের ষাট বৎসর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠান/৯৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সংসদের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের অতীত ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য একটি সংকলনও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে—যা এলাকার গৌরবোজ্জল ইতিহাসের সূচনা করছে। প্রাক্তন ছাত্র সংসদের এই মহতী প্রয়াস নিশ্চয়ই একটি সাহসীকতার কাজ। বিদ্যালয়টি মনোহরদী—বেলাব থানার মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসাবে এলাকার বিস্তর অঞ্চলে ত্রিশ দশকের গোঁড়া থেকে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে আসছে যা দেশ ও জাতির জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে। আমি প্রাক্তন ছাত্র সংসদের সকল সদস্যদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। পরিশেষে আমি বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ জামাল উদ্দীন ভূঁইয়া)
সহ—সভাপতি,
ঢাকা টেক্সেস বার।

সভাপতির কথা

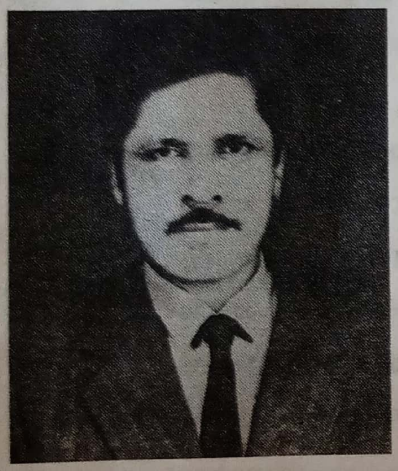

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের 'হীরক জয়ন্তী' উপলক্ষে একটি সংকলন বেরুতে যাচ্ছে। উক্ত সংকলন এই বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদেরই দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফসল। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে সুদীর্ঘ সময়ে এই মহতি প্রয়াসকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব এর পিছনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন তাদের প্রতি জানাই প্রাক্তন ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিশেষ করে এর সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত অধ্যাপক শহীদুর রশীদ ভূঁইয়ার কর্মপ্রেরণা ও সুন্দর মানসিকতা একে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়েছে। আরও স্মরণ করছি এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বাংলাদেশের খ্যাতিমান মরমী কবি জনাব সাবির আহমেদ চৌধুরীর কথা যিনি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

পৃথিবী এগিয়ে চলছে। এর সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও চাই একটি সুন্দর পৃথিবী ও একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে। এর জন্য চাই শিক্ষা। শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গণে সুন্দর ও কলুষমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের। এ দায়িত্ব দলমত নির্বিশেষে আমাদের সকলের। অশান্তি, অরাজকতা, উচ্ছৃংখলতা, সন্ত্রাস চিরতরে স্তব্ধ করে সেখানে সৃষ্টি করতে হবে মানবতাবাদ ও উন্নত মানসিকতা। ভালবাসা, সত্য ও ন্যায়ের সমাজ গড়ে তুলার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করতে হবে। এসবের জন্য দরকার সুশিক্ষা। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। গ্রাম বাংলার মাটি ও সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য দরকার প্রকৃত শিক্ষিত জনগোষ্ঠি।

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ পাঁচ যুগেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর ষাট বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান একটি বিরল ঘটনা। তিরিশ দশকের এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠের পুরানো স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এই স্মরনিকা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি মাইলফলক হিসাবে কাজ করবে। এ সংকলনটি যদি পাঠক পাঠিকাদের কিছুটা আনন্দ দান করে থাকে তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব। দেশের অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন কি বিদেশ বিভূঁইয়ে এই বিদ্যালয়ের অনেক প্রতিভাধর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী স্কুলের অতীত স্মৃতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখছে কিন্তু আমরা অনেকেই তা খোঁজ করিনা। দীর্ঘ সময় পিছনে চলে গেলেও আমরা এসমস্ত প্রতিথযশা ব্যক্তিত্বদের স্মরণ করার ক্ষীণ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে চাই। অবচেতন মন থেকে স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে চাই। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক ভূলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভূলকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে খুশী হব। আমাদের অনুজ ও অগ্রজদের প্রতি রইলো প্রাণঢালাশুভেচ্ছা।

মোঃ শহীদুল্লাহ ভুইয়া
সভাপতি, প্রাক্তন ছাত্র সংসদ
পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য

১৯৯০ ইং সনেই পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্ণ হয়েছে। কিছুটা বিলম্বে হলেও প্রাক্তন ছাত্র সংসদ ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী উৎসব আয়োজন করতে যাচ্ছে দেখে আমি গর্ব ও আনন্দ অনুভব করছি।

নিভৃত পল্লী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় পোড়াদিয়া এবং এর আশে পাশের ব্যাপক এলাকা জুড়ে দীর্ঘ দিন ধরে ছড়িয়ে যাচ্ছে জ্ঞানের আলো। দেশ জাতি ও সমাজের সেবায় নিয়োজিত বহু মেধা ও সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছে এই বিদ্যালয়ে। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের এই উৎসবের লগ্নে তাই শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি তাঁদের যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ এই বিদ্যালয় বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি এই বিদ্যালয়ের সকল প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের এই উপলক্ষে জানাচ্ছি মোবারকবাদ ও অভিনন্দন। কামনা করছি বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি।

মুছলেহ উদ্দিন আহমেদ
প্রধান শিক্ষক
পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

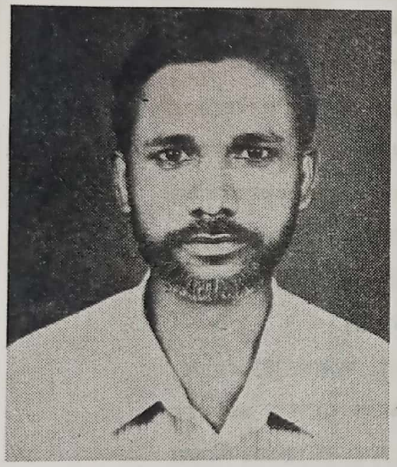

সাধারণ সম্পাদকের কথা

অল্প ক'দিনের ভেতরই উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী উৎসব। প্রাক্তন ছাত্র সংসদের সদস্য সদস্যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, প্রচন্ড কর্মচাঞ্চল্য আর দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণেই কেবল বিলম্বে হলেও নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে আমরা এই উৎসব অনুষ্ঠানের দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। এই অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সফল করে তোলার জন্য যারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন সকলকেই আমি জানাই আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

এই পূর্তি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবীন আর প্রবীণ আসবেন কাছাকাছি। খোলামেলা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় পাবে নতুন দিক নির্দেশনা। নতুন করে জানতে পারবো এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস এই প্রত্যাশা আমি করি।

সবশেষে আমি এই হীরক জয়ন্তী '৯৪ এর সাফল্য কামনা করি।

আঃ ছাত্তার মোল্লা
সাধারণ সম্পাদক
প্রাক্তন ছাত্র সংসদ
পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

এটা কোন সাহিত্য সংকলন নয়। এর বিষয়বস্তু এতটা বৈচিত্রপূর্ণ যে, একে কেবল স্মরনিকা বলবো সে উপায়ও নেই। ফলে এই প্রকাশনাটাকে প্রথাসিদ্ধ কোন ছাঁচে ফেলা প্রায় অসম্ভব। বিষয়বস্তু যত ভিন্নতরই হোক না কেন আমাদের লক্ষ্য কিন্তু পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী উৎসবকে অবলম্বন করে নানা আবেগ অনুভূতিকে গ্রন্থিবদ্ধ করা। উদ্দেশ্য অতীতকে মেলে ধরা বর্তমানের কাছে, সেকালকে নিয়ে আসা একালের সামনে। একটি অদৃশ্য সেতু রচনা করা নবীনে প্রবীণে। সেজন্যই অনেক লিখেছেন এর আগে এমন লেখকের লেখাও যেমন এসেছে, কখনও লেখেননি এই প্রথম তেমন লেখকের লেখাও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেবল গুণগত মান নয় আবেগও কখনো যে প্রধান হয়ে উঠতে পারে তা আমরা অস্বীকার করি কেমন করে। সে জন্যই নানা বয়সের আবেগ উচ্ছাস, স্মৃতি বিস্মৃতিকে ধারণ করা হয়েছে একটি বিনে সূতোর বন্ধন তৈরি হবে এই প্রত্যয়ে।

এই বিদ্যালয়ের আছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। এর সকল কথা, সকল ইতিহাস, সকল বিষয় যদি উপস্থাপন করা যেতো তো আরো ভাল হতো। তথ্যের অপ্রতুলতা, নথীপত্রের অভাব আমাদের বঞ্চিত করেছে বহু না জানা বিষয় উপস্থাপনে। ভাল হতো যদি সকল পাশ করা ছাত্র ছাত্রীদের নাম ধাম পাওয়া যেতো, সুন্দর হতো যদি বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড আর খেলাধূলার কিছু আলোক চিত্র এতে সন্নিবেশন করা যেতো। আমরা তা পারিনি বলে দুঃখিত।

যত সাধ তত সাধ্য নেই আমাদের। তার উপর আছে মুদ্রণ ব্যয় আর কাগজের দুর্মূল্যতা। ফলে খুব সংগত কারণেই সকলের লেখাকে এতে স্থান করে নেবার সুযোগ করে দেওয়া গেলো না। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত কঠোরতা ক্ষমার্হ হবে বলে আমরা মনে করি।

লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সহযোগিতা দিয়ে, আর্থিক অনুদান দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা এই সংকলনকে দিনের আলোতে নিয়ে আসার পথ করে দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

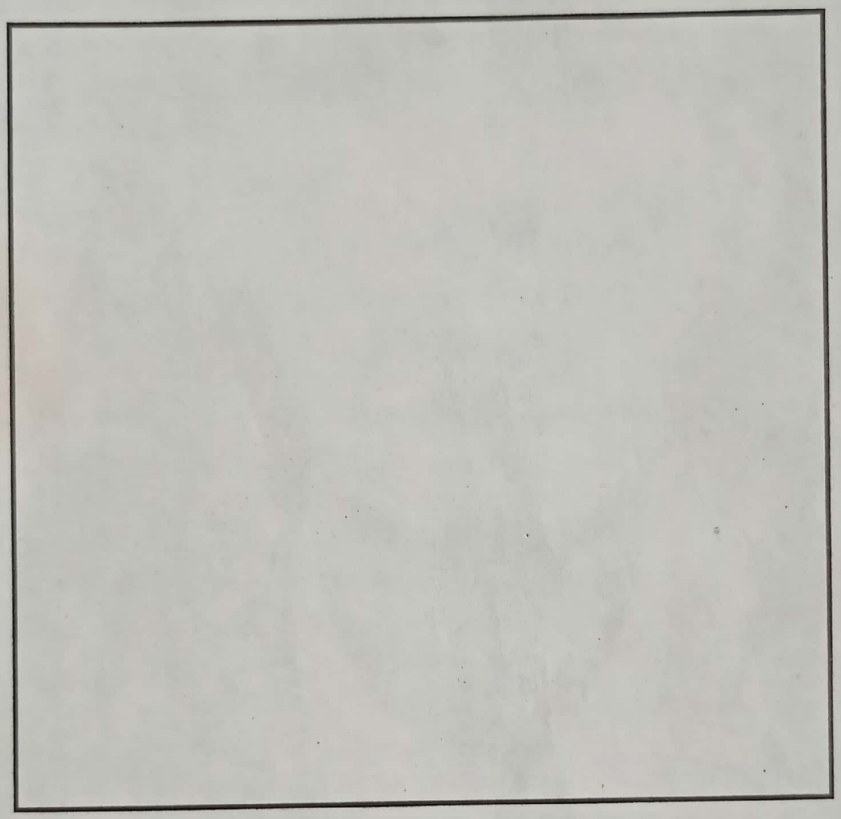

মরহুম মোঃ ইলিয়াছ মিয়া

আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি দূর দৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষক ও সংগঠক মরহুম মোঃ ইলিয়াছ মিয়া সাহেবের কথা যাঁর অনুপ্রেরণায় গোড়াপত্তন হয়েছিল এই পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে।

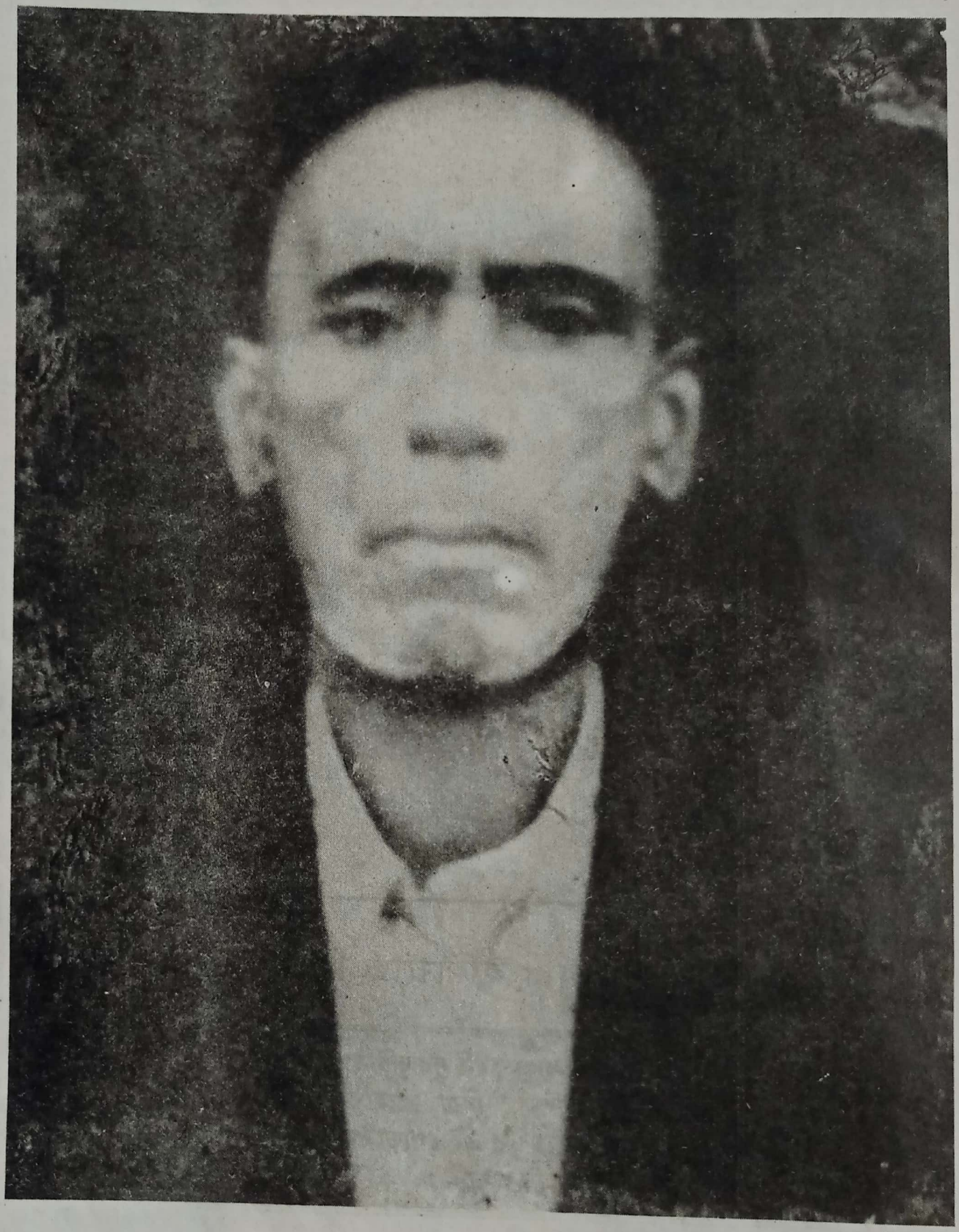

মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া

আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া সাহেবকে যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম বিদ্যালয়কে পরিণত করেছে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে।

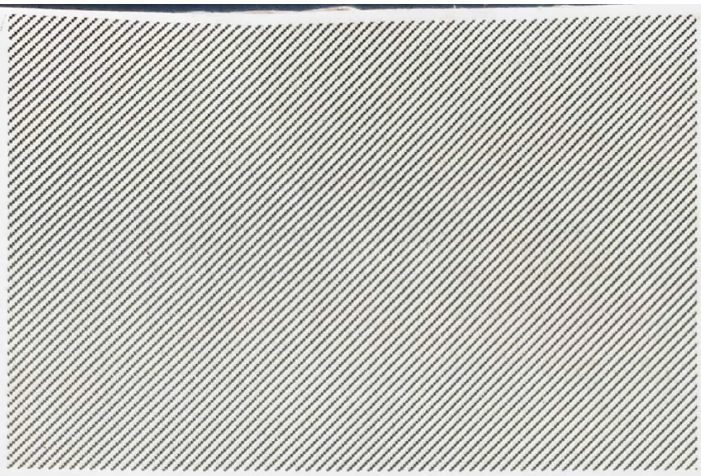

এক নজরে পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

প্রথম নাম	ঃ	পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুল।
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকারী	ঃ	মরহুম মোঃ ইলিয়াছ মিয়া
বিদ্যালয়ের জমি দাতার নাম	ঃ	মরহুম সোনা উল্লা মৃধা
বিদ্যালয়ের প্রথম সভাপতি	ঃ	তৎকালীন এস. ডি. ও, নারায়ণগঞ্জ
বিদ্যালয়ের প্রথম সেক্রেটারী	ঃ	মরহুম আঃ হামিদ ভূইয়া
বিদ্যালয় স্থাপনকাল	ঃ	১৯৩০ ইং
বিদ্যালয়ের অবস্থান	ঃ	নরসিংদী জেলা থেকে ৩২ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে বেলাব থানার (সাবেক মনোহরদী থানা) পোড়াদিয়ায়।
বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি কাল	ঃ	০১–০৯–'৩৬ ইং
প্রথম ছাত্র ভর্তি শুরু	ঃ	০১–০১–'৩০ ইং
প্রথম ছাত্রী ভর্তি শুরু	ঃ	১৯৫৯ ইং
বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক	ঃ	মরহুম মোঃ জনব আলী
বিদ্যালয়ের প্রথম পুরস্কার	ঃ	ভাওয়াল রাজার প্রতিনিধির প্রতি মাসে ১০০/=করে স্থায়ী মঞ্জুরী
বিদ্যালয়ের বর্তমান নাম	ঃ	পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	ঃ	৫৭৩ জন
বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা	ঃ	১৪ জন
বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক	ঃ	জনাব মুছলেহ উদ্দিন আহমেদ

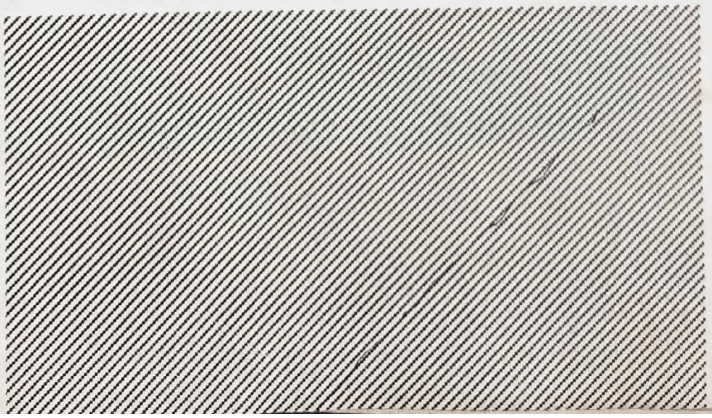

প্রধান শিক্ষক অতীতের যাঁরা

জনব আলী
আব্দুল হক
মৌঃ আবু তাহের
হানিফ মিয়া
আবু নাসের ওহিদ
বাবু কামিনী রায়
মোজাফফর আহম্মদ
আনোয়ার হোসেন
আব্দুল হক
মাহবুবুল হক
হাসান আলী
ইউনুছ আলী ভূইয়া
সামসুল হক (ভারপ্রাপ্ত)
মজিবুর রহমান
আওরঙ্গজেব ইয়াকুব
মোঃ শহীদুল্লাহ ভূইয়া
সামসুদ্দিন আহমদ
জিন্নত আলী
আপ্তাবউদ্দীন
শাহ বদরুদ্দীন
আব্দুল কাদির
ফজলুর রহমান

ছবিতে পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের মাঠে শরীর চর্চারত ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ।

সম্পাদনা উপ—পরিষদ

উপর বাম দিক থেকে ঃ *আঃ ছাত্তার মোল্লা (সদস্য), মোঃ নূরুল আমিন (সদস্য), মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক (সদস্য), মোঃ শহীদুর রশীদ ভুঁইয়া (সম্পাদক), মোঃ শহীদুল্লাহ ভূইয়া (সদস্য), আনোয়ারা হোসেন (সদস্য) ও আঁখি ভূষণ ভৌমিক (সদস্য)।*

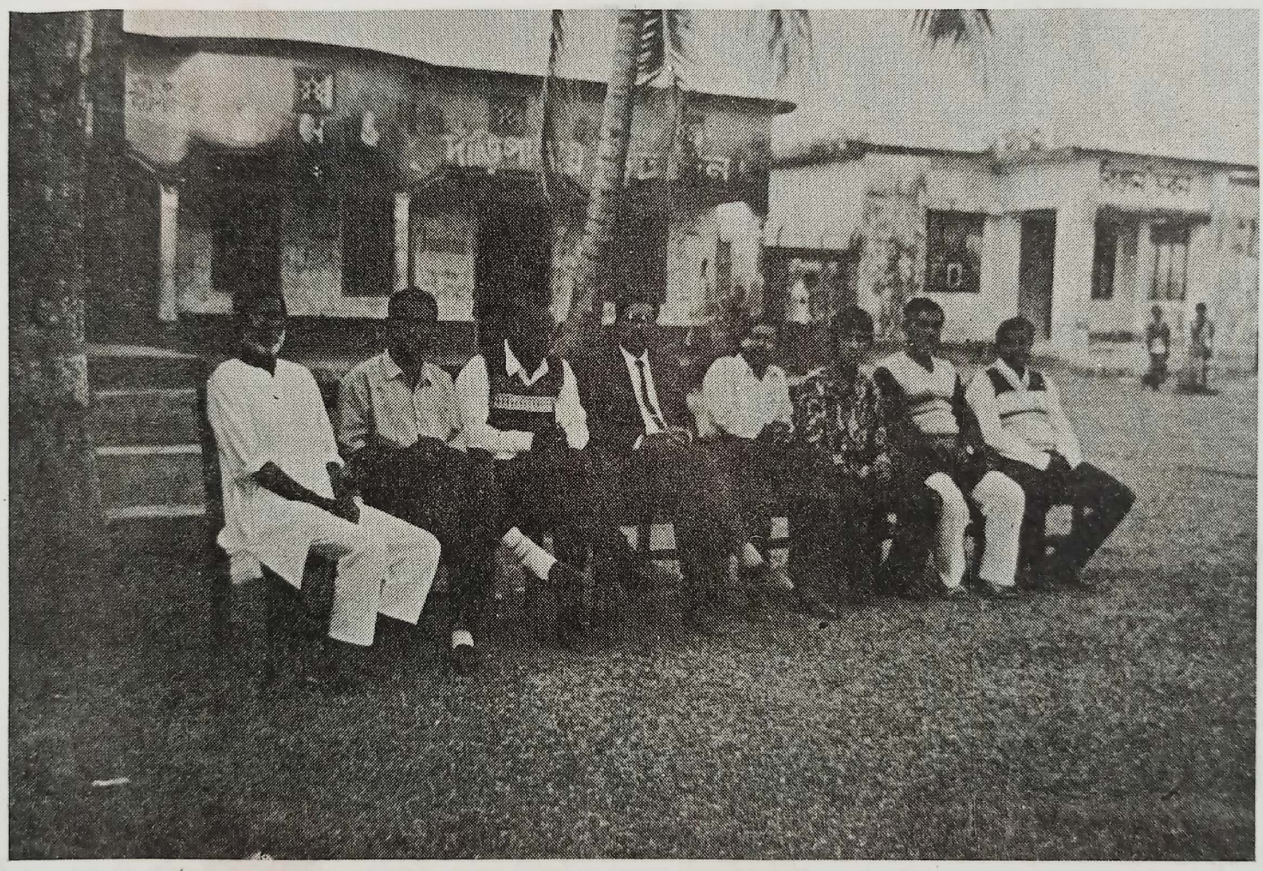

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ

বাম দিক থেকে ঃ *তমিজ উদ্দিন আহম্মেদ (সদস্য), আঃ ছাত্তার মোল্লা (সদস্য), মুছলেহ উদ্দিন আহমেদ (প্রঃ শিক্ষক), মোঃ শহীদুল্লাহ ভূইয়া (চেয়ারম্যান), মোহাম্মদ আলী (ভাইস চেয়ারম্যান), জাকির হোসেন ভূইয়া (সদস্য) আব্দুল গণি (সদস্য), আশুাব উদ্দিন ভূঞা (সদস্য)।*

বিদ্যালয়ের শিক্ষক মন্ডলী

বাম দিক থেকে ঃ আলহাজ্ব মোঃ শহীদুল্লাহ, নজরুল ইসলাম, আশুাব উদ্দিন ভূঞা, শফিকুল আলম, আব্দুল খালেক, মোঃ মোফাজ্জল হক, আবুল কাশেম, মুছলেহ উদ্দিন আহম্মেদ, আব্দুল গণি, ফজলুল হক, শ্রী রতন রঞ্জন রক্ষিত, মোমতাজ উদ্দিন , আজহারুল হক, শাহজাহান মিয়া।

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

অধ্যাপক ডঃ আব্দুল মান্নান	❐	জ্বেলে গেল একটি দীপ/২০
সাবির আহমেদ চৌধুরী	❐	আকাশ আমার ঘরের ছাউনি/২৩
ডঃ ম. আখতারুজ্জামান	❐	পোড়াদিয়াতে ছাত্র জীবনের দুই বছর/২৬
সোহরাব উদ্দিন আহমেদ	❐	রোমন্থন/৩২
মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া	❐	অন্য এক রকম স্মৃতিচারণ/৩৩
মোঃ শহীদুল্লাহ ভূইয়া	❐	পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুলের সৃষ্টির কিছু ইতিহাস/৩৫
মোঃ শামসুল হক	❐	আমার স্মৃতিতে পোড়াদিয়া হাই স্কুল/৪০
মোঃ নূরুল আমিন	❐	অনন্য ব্যক্তিত্ব মরহুম আব্দুল হামিদ ভুইয়া/৪২
মোঃ সাইদুর রহমান	❐	সন্ত্রাসের জন্ম ও উৎখাতের উপায়/৪৬
আঁখি ভূষণ ভৌমিক	❐	আধুনিকতায় বিজ্ঞান/৪৭
আনোয়ারা হোসেন	❐	যুব সম্প্রদায়ের নৈতিক অবক্ষয়/৪৮
মোঃ মোফাজ্জল হক	❐	স্বাধীনতা/৫০

কবিতা

ইউনুছ আলী ভূঞা	❐	নালী বিল/৫২
আলহাজ্জ মোহাম্মদ আবু তাহের	❐	নামায/৫৩
আব্দুল কাদির	❐	I remember./৫৪
মোঃ রুস্তম আলী	❐	ফাগুন/৫৫
মোছাঃ তাহমিনা সুলতানা	❐	এরই নাম স্বাধীনতা/৫৫
মোঃ রইছ উদ্দিন আকন্দ	❐	Some-কিছু/৫৬
মিস রৌশন আরা	❐	নারী শিক্ষা/৫৭
মোঃ আনোয়ার হোসেন	❐	নববর্ষের ছোয়াচ/৫৭
এম, আনোয়ার হোসেন	❐	এভাবে ক'দিন/৫৭
মোঃ আসাদুজ্জামান	❐	মা/৫৭
হাছিনা সুলতানা চম্পা	❐	হে স্বাধীনতা/৫৮
সাজেদা আখতার	❐	হারিয়েছি যে দিন/৫৮
মাহফুজা জাহান মাফু	❐	নিশি যাত্রা/৫৮
মোঃ আনোয়ার হোসেন	❐	তোমায় পেয়ে/৫৯
ফরিদ আহম্মদ অমৃত	❐	বিন্নাবাঈদ/৫৯

গল্প

মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক	❐	সেই প্রজাপতি/৬০

জ্বেলে গেল একটি দীপ

প্রফেসর আব্দুল মান্নান
প্রাক্তন উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন।

আজ থেকে ঠিক চৌষট্টি বছর আগে পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালীন সমাজের কৃতী পুরুষ সিংহ মরহুম আব্দুল হামিদ ভূঁঞা সাহেব ও তার সহকর্মীবৃন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়।

ষাট বছর আগের কথা না হোক অন্তত ১৯৪০ সন থেকে পোড়াদিয়া তথা বেলাব—মনোহরদী নরসিংদী সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া নানা কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। এ সুদীর্ঘ ৬০ বছরে এখনকার প্রজন্মের সাথে তখনকার প্রজন্মের মন—মানসিকতা, জীবন—দর্শন, রাজনৈতিক সচেতনতা, আর্থ—সামাজিক পটভূমি ও সামগ্রিকভাবে জীবনের চিন্তা ধারায় এসেছে নানা বিবর্তন যা এক কথায় বলা যায় প্রগতি আর প্রতিক্রিয়াশীল এ দু' ধারার দ্বন্দ্ব যা এখন আমাদের সব কিছু কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে।

পরাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, ভারত বিভাগ ও পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধীতাকারীদের ষড়যন্ত্র—এসব মিলে এক অনৈক্যের বিষবাষ্পে আমরা আজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

কি কারণে দ্বি—জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল এবং কি কারণে সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ দেশের আপামর জনতা বিদ্রোহ করে ৩০ লাখ শহীদের রক্ত এবং লক্ষ লক্ষ মা—বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশ হয়েছিল তার সত্যিকার ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা সমন্ধে এ প্রজন্মের কাছে ধারাবাহিক তথ্য নিয়ে আজ কোন প্রকৃত ইতিহাস নেই। ফলে জাতীয় ঐক্য আজ অনুপস্থিত। বার্ধক্যের ভারে আমার স্মৃতিশক্তি আজ আর তেমন অটুট নেই। তাই বাল্য—কৈশোরের স্মৃতিচারণে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। তুব কিছু বলতে না পারলে বিবেক স্বস্তি পাবে না ভেবে এ প্রয়াস।

সম্ভবত ১৯৪১ সন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করেছে। হিন্দু—মুসলিম দাঙ্গার ডামাডোল বাজছে— কেউ কেউকে বিশ্বাস করতে পারছেনা। জমিদার—জোতদার, মহাজনদের শোষণ নিষ্পেষণ আর কুশাসনে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ দিশেহারা। অশিক্ষা কুসংস্কার তাদেরকে তীব্রভাবে গ্রাস করেছিল। অনাহার অর্ধাহার আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণায়, মহাজনের দেনার দায়ে বাড়িঘর জমাজমি বন্ধক রেখে ৮০—৯০ ভাগ মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে। জমিদার জোতদারের অধিকাংশ হিন্দু হলেও হিন্দু—মুসলমান জোতদারদের অত্যাচার, শোষণ, নিষ্পেষণের ধারায় তারা একই শ্রেণীভূক্ত।

এমনই এক পশ্চাদপদ অবস্থার পটভূমিতে নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ করে বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের শান্তনা স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় বৃটিশ সরকার ১৯১৩ সনে। যদিও সে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯২১ সালে। তখন সারা বাংলায় যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমান ছিলেন তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা ছাড়া এ অঞ্চলের দুঃস্থ, নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের মুক্তি আসবেনা। সে সময়ে ১৯৩০ সনে মরহুম আব্দুল হামিদ ভূঁঞা পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুল স্থাপন করেন। সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার স্কুল সমূহের স্বীকৃতি দিত। এ স্কুলের স্বীকৃতি "মুসলিম' শব্দটি স্কুলের নামের সাথে যুক্ত থাকায় আদায় হয়ে উঠে দুরূহ বিষয়। যা হোক, তখনকার সময়ে জমিদার জোতদারগণ নিজ স্বার্থে অহরহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটাতে শুরু করে। উভয়

সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু মহৎ ব্যক্তি সোহরাওয়ার্দী—গান্ধীজির আহবানে শান্তি কমিটি গঠন করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধের ব্যবস্থা নেন। মরহুম আব্দুল হামিদ ভূঁঞা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর শান্তির কাজে অবদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ স্কুলটির স্বীকৃতি অবশেষে প্রদান করেন।

সারা অঞ্চলে এ সময়ে আঙ্গুলে গোনা কয়েকটি মাধ্যমিক স্কুল ছিল। এ বিরাট অঞ্চলে মনোহরদী স্কুল, লাখপুর শিমুলিয়া স্কুল, হাতিরদিয়া স্কুল (১৯৪০—৪১) এবং পোড়াদিয়া হাই স্কুল উল্লেখযোগ্য ছিল।

আমার মনে পড়ে ১৯৪১ সনে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা (৪র্থ শ্রেণী) দেওয়ার জন্য পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুলে যাই। এই প্রথম আমার হাতিরদিয়ার বাইরে যাওয়া। আমি প্রথম যাই মনোহরদী স্কুলে ২য় শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা দিতে আমার ছোট চাচা রমিজ সাহেবের সাইকেলে চড়ে। তেমনি প্রথম ঢাকা যাই ষষ্ঠ শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে এবং সদর ঘাটে পানসী নৌকায় থেকে আমরা পরীক্ষা দেই। আর প্রথম নারায়নগঞ্জ যাই মেট্রিক পরীক্ষা দিতে।

আমরা ৬/৭ জন বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পোড়াদিয়া হাই স্কুলে যাই। সাথে ছিলেন আফসার স্যার (সৈয়দপুরের জনাব আফসার উদ্দিন মোল্যা) তিনি আমাদের বৃত্তি পরীক্ষার কোর্স প্রাইভেট পড়াতেন। পরীক্ষার সময় প্রথম জনাব মরহুম আব্দুল হামিদ ভূঁঞাকে দেখি যার এত নাম শুনেছিলাম। তিনি ছিলেন আমার বাবার পরম বন্ধু। তিনি অনেকের মত হেটে হাতির দিয়া বাজার বা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে যেতেন। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে বিশ্রাম নিতেন। এত সুন্দর সহজ সরল স্নেহ বৎসল মানুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। আমাকে অত্যন্ত আদর করতেন। আমার বাবা (মরহুম মোসলেম উদ্দিন পন্ডিত) সে সময়ে ডুমরা কান্দা প্রাথমিক স্কুলে হেড মাষ্টার ছিলেন। পরে সৈয়দপুর প্রাইমারী স্কুলে যখন পড়ান তখন আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ছাত্রদের বিনা পয়সায় স্কলারশীপ পরীক্ষার জন্য বাড়ী নিয়ে পড়াতেন এবং রাতের খাবারের ব্যবস্থাও করতেন। বাবাকে দেখেছি এবং জেনেছি একজন মহৎ প্রাণ আদর্শ শিক্ষক হিসেবে। তিনি যেমন স্নেহবৎসল ছিলেন তেমনি অত্যন্ত রাগীও ছিলেন। লেখাপড়ায় অবহেলা একদম সহ্য করতেন না। তাঁকে ছাত্ররা যেমন ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত তেমনি ভয় ও করত। সে সময়কার ছাত্র—শিক্ষক সম্পর্ক আজকে থাকলে সন্ত্রাস খুব একটা হত না। পোড়াদিয়ার বেশ কিছুদূর পশ্চিমে গঙ্গাজলী প্রবাহিত। পোড়াদিয়া হাই স্কুলে বৃত্তি—পরীক্ষা দিতে গিয়ে গঙ্গাজলী এবং এর উপর নির্মিত সেতু দেখি। লাল মাটির টিলা পাহাড়ের ছায়াঘেরা ঘনবন এবং গঙ্গাজলী সেতু আমাকে এত আনন্দিত ও অভিভূত করেছিল যে অনেক দিন অনেক অবকাশে বেড়াতে এসেছি এ জায়গায়। এ অঞ্চলের মানুষ (যাকে এখন বেলাব অঞ্চল বলা হয়) অত্যন্ত সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যের এবং মায়াধারী বলে প্রসিদ্ধ।

সে সময়ে মরহুম আব্দুল হামিদ ভূঁঞা এবং তার মত মহৎ ব্যক্তিগণ যদি স্কুল প্রতিষ্ঠা না করতেন তা হলে আজ মনোহরদী—বেলাব যে সব কৃতী সন্তানদের জন্য গর্বিত ও প্রসিদ্ধ তাদের জন্ম হতো কিনা সন্দেহ। জনাব হামিদ ভূঁঞা যে প্রদীপ জ্বেলে গেলেন এবং শত ঝড়ঝঞ্ঝা আগলিয়ে সে প্রদীপকে জ্বেলে রেখেছিলেন সে কারণে আজ এ অঞ্চলের অন্ধকার ঘুচে আলোকিত হয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে তাদের কৃতী সন্তানদের জন্য খ্যাতি ও সুনাম কুড়িয়েছে।

সে সময় আজকের মত এত সহজে বই পাওয়া যেত না বা কেনার সামর্থ ও গার্জিয়ানদের ছিল না। মনে আছে আমরা পুরান বই জোগাড় করে মাথায় বইয়ে বাজারে বাজারে বিক্রি করতাম। আজকের মত এত সহজে চলাচল করা সম্ভব ছিলনা। রাস্তাঘাট ছিলনা। পোড়াদিয়া —বেলাব বাজারে যেতে হত পায়ে হেটে রাস্তায় কোমর পানি ভেঙ্গে। এমনকি নরসিংদী, ঢাকা যেতে হোত পায়ে হেটে। অথবা গয়না/নৌকায়

লাখপুর—হাতিরদিয়া হতে সন্ধ্যায় উঠতাম এবং সারারাত শেষে ভোরে ডেমরায় নামতাম এবং হেটে নারায়ণগঞ্জ যেতাম।

আজকের ছাত্রদের কাছে এসব গল্পের মত শোনাবে। কি কঠোর প্ররিশ্রম করে যে লেখাপড়া করতে হয়েছে। তার মধ্যে ও সাহিত্য চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক স্কুলগুলোতে আমরা শিক্ষকগনের উৎসাহে করতাম। গ্রামে গ্রামে আমরা নাটক নামাতাম। কত লোক হত। মাঠে নাটক মঞ্চস্থ হত। বর্ষাকালে কত দোয়া করতাম নাটকের দিন যেন বৃষ্টি না আসে। এত ছিল নাটকের প্রতি আকর্ষণ।

ফুটবল খেলা তখন খুব আনন্দদায়ক ছিল। পোড়াদিয়ার সুরুজ আলী, ডেংগু, নিন্দু, আরও অনেকের নাম এখন মনে পড়ছেনা—তাদের নিয়ে একটি শক্তিশালী টিম করেছিলেন জনাব হামিদ ভূঁঞা সাহেব। এ টীমের খেলা থাকলে প্রচুর লোক সমাগম হত সে খেলায়। আজ সেসব শুধু স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি।

তখনকার দিনে ছাত্র—শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতা—পুত্রের সম্পর্ক। তাই কোন সন্ত্রাস ছিলনা। কেউ কারো দুঃখ, দারিদ্র বা দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজে বাঁচত না বা নিজ স্বার্থ দেখত না বলেই সন্ত্রাস হতো না। এমন নিঃস্বার্থ স্নেহ—প্রবণ ছিলেন শিক্ষকগণ—যাদের নাম শ্রদ্ধার সাথে আমরা আজও মনে করে আনন্দ পাই—গর্ববোধ করি। আমরা সে দিনের শিক্ষাকে সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা বলে গালি দেই কিন্তু লেখা—পড়ার পাঠ্যক্রম ছিল শক্ত ভিত্তির উপর এবং শিক্ষকগণ ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক ও সিরিয়াস।

ছাত্র—শিক্ষক সম্পর্কের অনেক কিছুই আজ আমাদের শিক্ষাঙ্গনে অনুপস্থিত। তাই আজ আমাদের শিক্ষাঙ্গনে এত নৈরাজ্য আর সন্ত্রাস।

আজকে পোড়াদিয়া স্কুলের এ হীরক জয়ন্তীতে বার বার মনে পড়ছে আমার প্রিয় মহান পূর্বসূরীদের যাঁরা এ দীপ জ্বেলে গেলেন বলেই আজ আমরা হীরক জয়ন্তীর অর্থ বুঝতে পেরেছি। পারছি দু'কলম লিখতে। আজ—তাঁদের জানাই হাজারো সালাম।

তাঁরা আমাদের মত বিদ্বান হয়ত ছিলেন না কিন্তু তাঁরা ছিলেন জ্ঞানী। বিদ্যার্জন যত সহজ জ্ঞানার্জন তত সহজ নয়। "রাব্বি জেদনী এলমান"— হে মহাপ্রভু আমাকে জ্ঞান দাও।" এ ছিল আমার সকাল—সন্ধ্যার প্রার্থনা। এ হোক সকল ছাত্র—ছাত্রীর সকাল—সন্ধ্যার প্রার্থনা—"রাব্বি জেদনী এলমান।"।

আকাশ আমার ঘরের ছাউনি

সাবির আহমেদ চৌধুরী
বিশিষ্ট মরমী কবি

মানব সমাজে আমার পরিচয়ঃ আমি একজন মানুষ। এই সুবিশাল বিস্তৃত পৃথিবী আমার ঘর। উন্নত—উদার আকাশ, পৃথিবী নামের এ ঘরের ছাউনি। এ পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ আমার পরম আত্মীয়। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যে যেখানে ঘর বেঁধে আছে, তারা প্রত্যেকে আমার ভাই। তাদের প্রত্যেকের সুখে আমি সুখী আর দুঃখে এ হৃদয়ে অনুভব করি তীব্র ব্যথা। আমি আবদ্ধ থাকতে চাইনা দেশ, কাল, গোত্র, গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধ গন্ডির ভেতর। আমি মানতে চাইনা জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণের কোন ভেদাভেদ। সবার উর্ধ্বে মানুষ এটাই আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

সাদা—কালো সব মানুষের শরীরে প্রবহমান যে রক্ত ধারা তার রং মূলত লাল। সুখে দুখে কামনা বাসনায় সকলের সম অনুভূতি। প্রেম—প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ ও মমতায় কোন তারতম্য নেই। আমরা সবাই পিতার ঔরষে মায়ের গর্ভের সন্তান। এই পৃথিবীতে সবার আগমনও একইভাবে। মায়ের গর্ভ থেকে মাটির গর্ভে চলে যাবো সেই একই নিয়মে, একই প্রক্রিয়ায়। সাদা বা কালো মানুষের জন্য আলাদা কোন প্রক্রিয়া নেই। নেই এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম। প্রত্যেকের জীবন শুরু থেকে শেষ অব্দি একই ধারায় সেই আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন শেষে বার্ধক্যের সীমায় পৌঁছে অতপর মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আমাদের চলে যেতে হয় এই পৃথিবী থেকে। চলে যেতে হয় দূর অজানার দেশে। যে দেশ থেকে কেউ কোনদিন আর ফিরে আসে না। জীবদ্দশায় রোগ—শোক—জরা—ব্যাধি থেকে হয়তো মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুর কালো ছোবল থেকে বেঁচে থাকার কারো সম্ভাবনা নেই। আমাদের জীবন খন্ডকালীন, এখানে কেউ চিরজীবি নয়। পৃথিবীতে খালি হাতে সবার আগমন আর মৃত্যুর সময়ও চলে যেতে হয় খালি হাতেই। সৃষ্টির সেই শুরু থেকে কত মানুষ এসেছে। একে একে সবাই চলে গেছে। এ যেনো খাঁচা ফেলে শুণ্যে দূর নীলিমায় পাখি উড়ে যাবার মত। খাঁচা পড়ে থাকবে ধুলায়, পাখি হারিয়ে যাবে নিরুদ্দেশে। ধন—সম্পদ, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য, রূপ—যৌবন, ক্ষমতার বলে বলীয়ান কত রাজা, মহারাজা এসেছে—কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তারা সবাই। যারা একদিন ক্ষমতার দাপটে এই পৃথিবীকে প্রকম্পিত করেছিল, তারা আজ কোথায় ? কোথায় আজ চেঙ্গিস? হালাকু? গজনীর মাহমুদ, কোথায় নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট? কোথায় গ্রীসের সিজার? কোথায় আলেকজান্ডার? তারপর সভ্যতার কত উত্থান—পতন। রোম সভ্যতা, স্পেনের সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, সব সভ্যতার ইতিহাস আজ আমাদের কাছে স্মৃতি। আরো অনেক সভ্যতার ইতিহাস যা আমাদের কাছে অজানা, অজ্ঞাত। সভ্যতার পাশাপাশি নবী, অবতার, কত জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, সাধু, দরবেশ যাঁদের কল্যাণে আর অবদানে এ পৃথিবী হয়েছে সুন্দর, মানুষ পেয়েছে সুন্দর জীবন ও সঠিক পথের সন্ধান, তাঁরাও চলে গেছেন সেই একইভাবে। সবাই একই পথের পথিক।

তাই ভাবতে অবাক লাগে এই অনিত্য পৃথিবীতে মানুষে মানুষে আজ দ্বন্দ্ব, এত কোলাহল, এত ভেদাভেদ, এত অসাম্য, এত বৈষম্য কেন? মানব সভ্যতা আজ মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ধ্বংসের সম্মুখীন, হিংসায় উন্মত্ত আজ সারা বিশ্ব। একদিকে পৃথিবীর কোটি কোটি মানব সন্তান অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত, কোটি কোটি শিশু বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখ, রোগে শোকে পুষ্টির অভাবে বেঁচে থাকার জন্য দিশেহারা, আর অন্যদিকে মানুষ তৈরী করছে মানুষকে মারার জন্য কোটি কোটি টাকার অস্ত্র। মানব সভ্যতার বিরুদ্ধেই অস্ত্র ব্যবহার করার প্রস্তুতি চলছে। এই অশান্ত পৃথিবীকে শান্তিময় মানুষের নিরাপদ আশ্রয় করে তুলতে তেমন

উদ্দোগীরা নেই কেন? তারা কি একবারো ভেবেছেন তাদের পূর্বের বিশ্ব নিয়ন্তাদের কথা? যারা তাদেরই মত এক সময় নিয়ন্ত্রণ করতো এ পৃথিবী? মহান স্রষ্টা ধন, জন ও শক্তি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন মাত্র?

কবির ভাষায়ঃ

"দিয়ে ধন বুঝে মন
কেড়ে নিতে কতক্ষণ?"

মানুষের ভেতরে এই পশুত্বকে পরাভূত করার জন্যই স্রষ্টা যুগে যুগে, কালে কালে, দেশে দেশে নবী, অবতার, প্রেরিত পুরুষ পাঠিয়েছেন। উপনিষদের ভাষায়—স্রষ্টা যখন আদি মানুষ মনুকে সৃষ্টি করেন তখন মনু (আদি মানব) স্রষ্টাকে প্রশ্ন করেছিলেন' "হে প্রভু আমি কে? কি আমার ধর্ম?" স্রষ্টা বলেছিলেনঃ তুমি আমার মন থেকে সৃষ্টি তাই তুমি মানুষ এবং তোমার ধর্ম মানব—ধর্ম তথা মানবতা। সাম্য ও মানবতার এই মহান সুর পবিত্র কোরানের সর্বত্র ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত। বাইবেল ও ত্রিপিটকেও ধ্বনিত হচ্ছে একই সুর। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থও ব্যতিক্রম নয়। দুঃখের সাথে বলতে হয়, আজ আমরা সবাই মানুষ—কিন্তু আমাদের ভেতরে সেই মানবতা কোথায়? আমাদের বিবেক আজ কেন পশুকেও হার মানায়? স্বার্থ নিয়ে আমরা অন্ধ কেন? বর্ণ—বৈষম্য ও জাত—বিজাতের শ্লোগান কেন সর্বত্র? মানুষে মানুষে এত বৈষম্য কেন?

বর্ণ—বৈষম্য, জাত—বিজাতের প্রসংগে সামান্য আলোকপাত করতে হয়। হিন্দুর ঘরে যে শিশুর জন্ম সে হিন্দু, মুসলমানের ঘরে যার জন্ম সে মুসলমান। খৃষ্টানের ঘরে যে শিশুর জন্ম সে খৃষ্টান আবার যে শিশুর জন্ম যে দেশে সে সেই দেশেরই পরিচয় বহন করে। অথচ মায়ের গর্ভে থাকাকালে সকল দেশের সকল শিশু তখন পরিচিত 'সন্তান' হিসেবে। আবার মৃত্যুর পর সেই মানুষের একমাত্র পরিচয় সে একটি লাশ অর্থাৎ Dead body তখন তার কোন জাত থাকে না। আবার যিনি স্রষ্টা, যিনি সৃষ্টি করেছেন সব মানুষকে তারও কোন জাত নেই। জাত এবং জাতিগত এ পার্থক্য নির্ণয় আমরাই করে থাকি। আমাদের সমাজ কাঠামো এভাবেই তৈরী হয়েছে।

স্রষ্টা তাই বিশ্ব মানুষকে কলুষ—কালিমা থকে মুক্ত করার জন্যই মানব কল্যাণ ও বিশ্ব শান্তির বাণী দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান করেছেন। উপনিষদ, বাইবেল, ত্রিপিটক, পবিত্র কোরান সবার মুলমন্ত্র তাই এক ও অভিন্ন। বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণ—এটাই সব ধর্মের মুল কথা। অবতার, নবী, প্রেরিত পুরুষ সবারই প্রচলিত ধর্মের সারমর্ম এক। কেউ কোন ভিন্ন মতাদর্শ প্রচার করেননি। যেহেতু স্রষ্টা এক— তাই এক স্রষ্টা প্রবর্তিত বিধান ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না। একই চন্দ্র সুর্য যেমন সারা পৃথিবীতে সমভাবে আলো দেয়—তেমনি ধর্মের মুল বাণীরও কোন তফাৎ নেই।

পৃথিবী হোক স্বর্গের একটি প্রতিচ্ছবি। স্রষ্টার এই ইচ্ছাতেই হয়তো আদমকে পৃথিবীতে আসার আগে স্বর্গীয় রীতিনীতি অবগত করানোর উদ্দেশ্যে প্রথমেই তাঁকে স্বর্গে রাখা হয়েছিল। স্রষ্টা চেয়েছেন এ পৃথিবী হোক স্বর্গের মতন। আমরা কি স্রষ্টার এই ইচ্ছে পূরণ করতে পেরেছি? আজ কোথায় সেই বিশ্ব বিবেক? পশু সদৃশ মানুষের এহেন কান্ড দেখে হয়তো স্রষ্টাও আক্ষেপ করছেনঃ হায় কবে জাগবে বিশ্ব বিবেক? কবে একের দুঃখে আরেকজন দুঃখ পাবে? দেশ, কাল এবং সীমার এই তুচ্ছ গন্ডি দেশে দেশে কবে শেষ হবে? স্রষ্টাতো চেয়েছিলেন বিশাল মানব পরিবার যেখানে দেশ, কাল, ভাষা, বর্ণ কোন কিছুই স্থান পাবে না। থাকবে না কোন ব্যবধান। সবাই থাকবে এক আকাশের নীচে এক পৃথিবীর এক শাসকের এক পরিবার। আর একই নিয়ম—কানুন, শৃংখলা ও আইনের অণুশাসনে পরিচালিত হবে সুবিশাল মানব জাতি। সাম্য, মৈত্রি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে মানব গোষ্ঠী। বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণই হবে সব মানুষের আদর্শ।

মুলত স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা ও সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ জাগাতে পারলেই এ পৃথিবী স্বর্গের প্রতিচ্ছবি হতে পারতো। সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে স্রষ্টা নয়। সৃষ্ট জীবের সেবাতেই স্রষ্টা থাকেন তুষ্ট। চোখের দৃষ্টি নাইবা থাকুক, অন্তরের দৃষ্টি হোক সুতীক্ষ্ণ, প্রখর।

ধর্মে যে ভয়—ভীতি দেখানো হয়েছে তা প্রকৃত পক্ষে বিশ্ব শান্তি ও মানব কল্যাণের জন্যেই। আমাদের কৃতকর্ম বা কাজের জবাবদিহি করতে হবে এই বোধ নেই বলেই আমরা পর্যায়ক্রমে অন্যায় করে

চলেছি। আমরা যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভালোর জন্য চিন্তা করি প্রত্যেকের বিবেক যদি সতর্ক প্রহরীর মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে তবেই পৃথিবীতে সত্য, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ধর্মীয় চিন্তা চেতনায় বিশ্ব মানুষ যদি সবাই সচেতন থাকে তাহলে পৃথিবীতে অশান্তি হতো না। কেননা সব ধর্মের মুলমন্ত্রই হচ্ছে বিশ্ব শান্তি ও মানব কল্যাণ।

সুতরাং আত্মজ্ঞান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত করতে হবে আমাদের মন ও মননকে। সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টা বিরাজমান। সমস্ত সৃষ্টির মুলে তিনিই—অর্থাৎ স্রষ্টা। এই স্রষ্টাকে চিনতে হলে নিজকে চিনতে হবে। সৃষ্টির মূলে আমি। আমার (মানুষ) জন্যই স্রষ্টার সকল সৃষ্টি। এই বিশ্বব্রহ্মান্ড আমার সত্ত্বায় মন্ডিত। 'আমি' সত্ত্বাই এই ব্রহ্মান্ডের খন্ডিত রূপ। আত্ম উপলব্ধির শক্তিতে 'আমি'ই সেই পরম সত্য ও সুন্দর। ভাবের রাজ্যে একমাত্র আমি—এর সত্ত্বা ছাড়া আর সকল সত্ত্বাই নশ্বর। মানবাত্মার পরম বিকাশই পরমাত্মার চরম প্রকাশ। আত্মজ্ঞানে যে শ্রেষ্ঠজ্ঞানী সেইতো শ্রেষ্ঠ মানুষ।

আমার জীবন চেতনায় এ রকম বহুবিধ প্রশ্ন ও ভাব একের পর এক ভীড় করে—ব্যথিত হৃদয় আহত করে। আর এ কারণেই কর্ম জীবনের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা ও লেখার অভ্যেস চালিয়ে আসছি। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম, শাস্ত্রের নিগুঢ় তথ্য সংগ্রহ মুল্যবান জ্ঞান আহরণের প্রয়াস চালিয়েছি।

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—বিশ্বজনীন এই আবেদন আমি পৌঁছে দিতে চাই পৃথিবীর সব মানুষের ঘরে ঘরে।

আমার শ্রম তখনি সার্থক বলে মনে করবো—যখন দেখবো সবাই মিলেমিশে এই সুবিশাল পৃথিবীতে একটি শান্তির পরিবার গড়ে তুলেছে। যে পরিবারে বর্ণ—বৈষম্য বা জাতিগত কোন ভেদাভেদ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ পবিত্র প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। অনিত্য এই মানব জীবন এবং দু'দিনের এই সংসার জেনে সকল প্রকার হিংসা বিদ্বেষ ও লোভ লালসার উর্ধ্বে থেকে দেশে দেশে ভৌগোলিক সীমা ঘুচিয়ে সমগ্র বিশ্ব একটি দেশে পরিণত হয়েছে। যেখানে কোন হানাহানি, সন্ত্রাস, রক্তারক্তি নেই। আর নেই মানুষের কোন ভিন্ন গোত্র গোষ্ঠি—একটিই জাতি সে জাতির নাম 'মানুষ জাতি।"

মানব গোষ্ঠির সকলে সুখী হোক। অন্ত প্রতিযোগিতা মুক্ত হোক এই সুন্দর পৃথিবী। জাগ্রত হোক বিশ্ব বিবেক। আনন্দময় হোক সবার জীবন—আমীন।

পোড়াদিয়াতে ছাত্র—জীবনের দুই বছর

ডঃ ম. আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বয়স হলে মানুষের বাল্য—স্মৃতি নাকি ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। শিক্ষকতা পেশায় সারা জীবন কাটিয়ে অবসর নেবার বছরে এসে পৌছলাম এ বছর। অবাক হয়ে দেখছি, ঐ কথাটা বোধ হয় আমার বেলায়ও খাটে। তবে আমার—বেশী করে মনে পড়ে ছাত্র জীবনের প্রথম দিককার কথা, যখন আমার অজ্ঞাতেই আমার পরবর্তী জীবনের গোড়া—পত্তন হচ্ছিল। এ পর্বের একাবারে শুরু না হলেও পোড়াদিয়া মুসলীম উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার দুটি বছর (১৯৪৪—৪৫) ছিল আমার জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

আমার সমগ্র শিক্ষা জীবনকে আমি দুই ভাগে ভাগ করতে পছন্দ করি। একটি আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক—স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশে বিদেশে অধ্যয়ন। অন্যটি অনানুষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক—এসবের বাইরে। প্রথম পর্বের শেষ হয়েছিল বহুকাল আগে। কিন্তু দ্বিতীয়টি এখনও শেষ হয়নি। আমৃত্যু চলবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাপর্বটি কিভাবে পোড়াদিয়াতে শুরু হয়েছিল, এবং তার প্রকৃতিই বা কি ছিল, সে আলোচনা এখানে করব খুব সংক্ষেপে। পাঠক এতে হয়তো তখনকার পোড়াদিয়া অঞ্চলের সাংস্কৃতিক—রাজনৈতিক অবস্থার কথা এবং তখনকার স্থানীয় কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামান্য পরিচয়ও পাবেন।

মাত্র সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্র পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও এর শাখা আড়িয়াল খাঁ নদীর বাধা অতিক্রম করে গ্রাম থেকে ৮/১০ মাইল দূরে কিভাবে পড়তে এল, তা জানালে বোধ হয় বিগত পাঁচ দশকে এ অঞ্চলে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার প্রকৃতি কিছুটা অনুধাবন করা যাবে।

পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাঁশগাড়ী থেকে মাইনর স্কুল (৬ষ্ঠ শ্রেণী) শেষ করার পর গ্রামের আশেপাশে ৫/৬ মাইলের মধ্যেও কোন উচ্চ বিদ্যালয় পেলাম না। উত্তরে কুলিয়ারচর এবং দক্ষিণে ভৈরবে তখনই উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। দূরত্ব প্রায় সমান—সম্ভবতঃ ৫/৬ মাইল। গ্রামের আধ মাইলের মধ্যে কালিকাপ্রসাদ রেল স্টেশান। কিন্তু তখন চলছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সৈন্য ও রসদবাহী গাড়ীগুলি সে স্টেশনে থামলেও যাত্রীবাহী কোন গাড়ী থামত না। তাই এর কোনটাতে পড়া হলো না। ডোমরাকান্দা —কাশিমনগরের কাছে ছিল একটি উচ্চ বিদ্যালয়। গ্রাম থেকে উত্তর—পশ্চিমে ৫/৬ মাইল। স্থানীয় আত্মীয়দের উৎসাহে গেলাম সেখানে খোঁজ নিতে। কিন্তু বিদ্যালয়টি তেমন পছন্দ হলো না। আত্মীয়দের একজন বললেন পোড়াদিয়া বিদ্যালয়ের কথা। ওখান থেকে বোধ হয় মাইল তিনেক পশ্চিমে। ঐ অঞ্চলের সঙ্গে ছিল পোড়াদিয়ার সহজ যোগাযোগ।

সম্ভবতঃ ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসের কোন একদিন। শীতের নরম রোদে, শিশির ভেজা মেঠো পথে পায়ে হেঁটে এসে পৌছাই পোড়াদিয়াতে। প্রশস্ত এক নদীর উঁচু তীরে, পূর্ব এবং দক্ষিণ খোলা বিরাট খেলার মাঠের উত্তর পশ্চিমে বিদ্যালয়ের এল—ধরনের লম্বা টিনের ঘর। সঙ্গেই বাজার। প্রথম দেখাতেই বিদ্যালয়টি পছন্দ হয়ে গেলো এর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে। এখানেই পড়ব বলে মনস্তির করলাম। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও কেন জানি আমাকে ভর্তি করে নিতে খুবই আগ্রহী হলেন। থাকার ব্যবস্থা করবেন বলে জানালেন। সেদিন ছিল হাটবার। বাজার ভর্তি মানুষ। অল্পক্ষণ পরেই এলেন স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী, সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। মুন্সী সাহেব বলে পরিচিত। বিদ্যালয় থেকে মাইল দেড়েক দূরে পাটুলী গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তিনি আগ্রহী হলেন তাঁর বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা করতে। ভর্তি হয়ে তাঁর সঙ্গেই সেদিন চলে গেলাম পাটুলীতে। ঐদিন থেকে দু'টো বছর কাটালাম পোড়াদিয়া—পাটুলী অঞ্চলে মুন্সীচাচার স্নেহশীল উদার অভিভাবকত্বে।

পাটুলী গ্রামটি বেশ বড়। হিন্দু—মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাসস্থল। খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। এ গ্রামে এসে আমার প্রথম পরিচয় ঘটল এদেশের দ্বিতীয় প্রধান সম্প্রদায়টির সঙ্গে। উভয় সম্প্রদায়ের কিছু ছাত্র (তখন কোন ছাত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ত না) দল বেঁধে যাতায়াত করতাম বিদ্যালয়ে। লাল মাটির দেশ। পথের দুই পাশে কাঁঠাল বাগান। মৌসুমে আমরা খোঁজ করতাম পথের পাশে কোন গাছে কাঁঠাল পেকেছে কিনা। সন্ধান পেলে তক্ষুনি পেড়ে নিয়ে গাছের তলাতে বসেই সকলে মিলে আহারপর্ব সেরে নিতাম। এভাবে গাছের নীচে পাকা কাঁঠাল খেলে কেউ কিছু বলত না। কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ছিল গর্হিত কাজ, চৌর্যবৃত্তি। এ নিয়মটা এখনও আছে কিনা জানি না।

প্রথম দেখাতে যেমনই মনে হোক, অচিরেই জানলাম যে অন্যান্য পাড়াগাঁয়ের বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির ন্যায় এ বিদ্যালয়টিরও আর্থিক দৈন্য প্রকট। তবুও আমাদের সৌভাগ্য যে বিদ্যালয়টিতে ছিল বেশ কিছু সুযোগ্য ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক। দুঃখের বিষয়, তাঁদের সকলের নাম এখন মনে নেই। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ভুলে যাওয়া অবশ্য সম্ভব নয়। কারণ তাঁর এবং আমার নাম একই। আর একজনের পদবী ছিল বোধ হয় নাহা। নৌকাঘাটার কাছে বাড়ী। এঁদের কথা বিশেষভাবে মনে আছে এ জন্যে যে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সমাজ সচেতন মানুষ। এক সময় সে কারণে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। ইউনুস সাহেব তখন এসেছেন মাত্র। যতদূর মনে পড়ে, তিনি ইংরাজী পড়াতেন।

১৯৪৩—এর ঐতিহাসিক মন্বন্তর সবে শেষ হয়েছে। চলমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট চলছে সারা বাংলায়। বাজারে নেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। ছাত্রদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাগজ ও কেরোসিন পর্যন্ত উধাও। কালেভদ্রে রেশনে মিলতো এসব। দোয়াতে জি—মার্কা নিব চুবিয়ে লিখতে হতো। ছাত্রছাত্রীদের এখনকার নিত্যসঙ্গী বলপেন তখনও চালু হয়নি। বহনযোগ্য কলমের মধ্যে ছিল ঝর্ণা কলম। কিন্তু যুদ্ধের বাজার বলেই হয়ত অত্যন্ত বিরল ছিল সে বস্তু। এ পরিস্থিতিতে এক সহপাঠির কাছ থেকে বোধ হয় আট আনা দিয়ে কিনেছিলাম একটি কুপন। তিনি আমার নাম পাঠিয়ে দিলেন কোলকাতার কুপন বিক্রেতার কাছে। কিছুদিন পর ডাকে পেলাম বোধহয় আরো আটখানা কুপন। নিয়মানুসারে এগুলো আটজনের কাছে বিক্রি করে সে টাকা পাঠিয়ে দিলাম ঐ ঠিকানায়। দুই তিন সপ্তাহ পর ডাকে পেলাম 'রাজা' ব্রান্ডের একটি ঝর্ণা কলম। সেটাই ছিল আমার প্রথম এ জাতীয় কলম। বুক পকেটে সদাসবর্দা ঝুলতো বিশিষ্টতার প্রতীক 'রাজা' মহাশয়।

খুব সম্ভবতঃ ১৯৪৪—এর শেষ দিকে কোন এক প্রসঙ্গে পরিচয় ঘটে যেমন লম্বা তেমনি হ্যাংলা—পাতলা গড়নের, সদা সাইকেল—আরোহী, নাটক ও পাঠ্যচক্র সংগঠন কর্মে প্রচন্ড উৎসাহী, অত্যন্ত সদালাপী এক ব্যক্তির সঙ্গে। নাম কালিপদ চক্রবর্তী। তিনি নিজ থেকে এসে আমাকে খুঁজে বের করেন। অগ্নিযুগের জেলখাটা রাজনৈতিক কর্মী। কিছুক্ষণ আলাপের পর কাঁধের ঝোলা থেকে বের করে দিলেন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। নাম "জনযুদ্ধ"। এর আগে বাজারে দোকানে মাঝে মাঝে লোকজনকে দেখেছি প্রত্রিকা পড়তে। বোধহয় দৈনিক আজাদ। জনযুদ্ধ পড়তে গিয়ে দেখি পত্রিকা ঠিক বইয়ের মত নয়। মাঝে মাঝে কলামের অংশ চলে যায় অন্য পাতায়। খুঁজে পেতে বের করতে হয়। অবশ্য দ্রুত শেখা হয়ে গেল পত্রিকা পড়ার নিয়ম—কানুন। আর খুব ভালো লাগলো পত্রিকাটির খবর এবং প্রবন্ধগুলি, যদিও আলোচিত বিষয়ের সবকিছু তখন বুঝতাম না। প্রতি সপ্তাহে আসতেন কালিদা। কি বুঝেছি, জানতে চাইতেন। আর যা বুঝতাম না, তা বুঝিয়ে দিতেন অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায়। এভাবে শুরু হলো আমার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন।

এভাবে কিছুদিন চললো। একদিন তিনি তাঁর ঝোলা থেকে বের করে দিলেন ভবানী সেনের লেখা "ভাঙ্গনের পথে বাংলা" ছোট পুস্তিকা। কিন্তু আমার চেনা—জানা গ্রামের সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা, সারা দেশের বিদ্যমান সংকটের কথা লেখা এমন সহজ সরল ভাষায় যে পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এ

প্রসঙ্গে আলোচনা হলো অনেক। তারপর তিনি একদিন এনে দিলেন ঐ লেখকেরই "মুক্তির পথে বাংলা"। প্রথম পুস্তিকায় উল্লেখিত সমস্যাগুলি সমাধানের পথ নিয়ে এতে ছিল বিশদ আলোচনা যদিও আমার অভিজ্ঞতা বয়সের কারণে খুবই সামান্য, তবুও মনে হলো লেখকের কথা ১০০ ভাগ খাঁটি। দু'টো পুস্তিকা পড়ে এবং কালিদার সাথে প্রাসঙ্গিক আলোচনার ফলে চারপাশের বাস্তব জীবন সম্পর্কে লাভ করতে শুরু করলাম এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। যাঁরা ঐ লেখকের নাম জানেন না, তাঁদের জানাই যে ভবানী সেন ছিলেন এক বিখ্যাত বুদ্ধিজীবি, কৃষক নেতা ও অবিভক্ত বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ।

এর কিছুদিন পর কালিদার ঝোলা থেকে বেরুল অনিল মুখার্জীর লেখা "সাম্যবাদের ভূমিকা"। শুধু বাংলা বা ভারতের নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাসের গতিধারা, মানব সমাজের বিকাশ, সমাজবিদ্যা ও দর্শন প্রভৃতির অনবদ্য বিবরণ এই ছোট্ট বইটিতে পাঠ করে মার্কসবাদী চিন্তাধারার সাথে প্রথম সামগ্রিক পরিচয় ঘটলো। বইটির দর্শন সংক্রান্ত আলোচনা দুর্বোধ্য ঠেকলেও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সে বয়সেও একটা বুঝ করা সম্ভব হয়েছিলো। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার এ পর্যায়ে এসে আমার চিন্তাশক্তির বিকাশে পুস্তকটির ভূমিকা ছিল অসাধারণ। পরে জগন্নাথ কলেজে যখন ছাত্র (১৯৪৮—৫০) তখন ঢাকায় প্রথম পরিচয় হয়েছিল লেখকের সঙ্গে। অত্যন্ত শান্ত, ধীরস্থির, বাস্তববাদী মানুষ। কি তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর বিশ্লেষণ শক্তি। আমার ধারণা, যাঁরা বাংলাভাষায় বাংলা—বিহার—আসাম অঞ্চলে মার্কসবাদের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই এ পুস্তকটি দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁর নিরহঙ্কার পান্ডিত্যের কথা কখনও ভুলতে পারবেন না।

পোড়াদিয়া গ্রামের অধিবাসী, ঠাকুর উপাধিধারী, জনৈক 'স্বদেশী' বাবুর সঙ্গে সে সময় পরিচয় ঘটে। তিনি ছিলেন জেলখাটা কংগ্রেসী। তাঁর কাছ থেকে ইংরেজীতে বই পড়ার তাগিদ পেতাম, যদিও সে সময় ততটুকু বিদ্যে আমার ছিল না। তিনি পড়ার জন্য দিয়েছিলেন এইচ, জি, ওয়েলসের সম্ভবতঃ "এ্যান আউটলাইন অব দি ওয়ার্ল্ড হিস্টরী" এবং নেহরুর "ডিস্‌কভারী অব ইন্ডিয়া"। আগাগোড়া পাঠ করেছিলাম। পড়ে তখন তেমন একটা কিছু বুঝিনি। তবে এতে একটা লাভ হয়েছিল। তখন থেকেই পাঠ্য বই ছাড়া অন্য বই পড়ার এবং বিশেষভাবে ইংরেজীতে লেখা বই পত্র পড়ার অভ্যেস গড়ে উঠতে থাকে, যার ফলে কলেজে ঢুকে ইংরেজীতে লেখা বই এবং পত্রপত্রিকা একরকম বুঝতে পারতাম। যাক্‌ সে কথা।

এভাবে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের মাধ্যমে আমার পরিচয় ঘটেছিল এক বিস্ময়কর নতুন জগতের সঙ্গে। এসময় ক্রমে আরো যাঁদের সংস্পর্শে আসি, তাঁদের মধ্যে স্থানীয় অন্ততঃ আরো দুইজন এবং অস্থানীয় আরো কয়েকজনের কথাও সংক্ষেপে বলতে হয়। ইতিমধ্যে অবশ্য বইপত্র পড়ার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে নানা রকম সাংগঠনিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছি। মূলতঃ ঐসব কাজকর্ম উপলক্ষ্যেই তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথমেই পরিচয় হয় মোহিত রায়ের সাথে। তিনিও অগ্নিযুগের জেলখাটা বিপ্লবী। তবে তখন সাংগঠনিক কাজে তেমন সক্রিয় নন। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও প্রচুর প্রভাব ছিল যেমনি তরুণ সমাজ, তেমনি সাধারণ মানুষের সাথে। পেশায় ছিলেন তিনি দর্জি। কিন্তু এ কাজ তিনি যত না করতেন, তার চাইতে পোড়াদিয়া বাজারের তাঁর দর্জি দোকানে আগত লোকজনদের সঙ্গে বেশী করতেন খোশগল্প। তার শার্টের পকেটে সর্বদা মজুদ থাকত বিড়ি। গ্রাহক এলে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মধুর হেসে প্রথমেই এগিয়ে দিতেন বিড়ি। তারপর দিন দুনিয়ার হেন জিনিস নেই যা নিয়ে চলত না আলাপ। গ্রাহক তাঁর একান্ত অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে চলে যেতেন, পোষাকটি প্রস্তুত হয়েছে কিনা, সে প্রসঙ্গ তুলবারই ফুরসত পেতেন না। এভাবেই চলত দিনের পর দিন , হয়ত একটি শার্টের অর্ডার দিয়ে গ্রাহক ফিরে ফিরে আসতেন কয়েক মাস। কিন্তু কেউ বিরক্ত হতেন না। জানিনা সচেতনভাবে কিনা, এভাবেই তিনি গ্রাহক যুবক ও সাধারণ মানুষদের মনে রাজনৈতিক

চেতনা পরোক্ষে বিকাশ ঘটিয়ে চলতেন। সকলের শ্রদ্ধা ও আস্থা তিনি অর্জন করেছিলেন। অনেকেই ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানেও বুদ্ধি পরামর্শের উদ্দেশ্যে আসতেন তাঁর কাছে।

মোহিতদার বিপরীতে অত্যন্ত সক্রিয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন অন্নদা পাল। চালাকচর থেকে সাইকেলে করে আসতেন তিনি। বয়স, পরিচিতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট ছিলেন অগ্নিযুগের এই বিপ্লবী। কালিদার ন্যায় তাঁরও বাহন ছিল একটি সাইকেল এবং কাঁধের ঝোলায় থাকতো রাজনৈতিক সাহিত্যের একটি চলমান ক্ষুদে লাইব্রেরী। তাঁর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় ঘটে ১৯৪৫ (?) সালে চালাকচরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগ সম্মেলনের একজন কর্মী হিসেবে। রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর আলোচনা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা তা কখনো ভুলবেন না।

চালাকচরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগ সম্মেলন ছিল শুধু এ অঞ্চলের নয়, সারা অবিভক্ত বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গীয় মুসলীম লীগে তখন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে "প্রগতিশীল" ও "প্রতিক্রিয়াশীল" অংশের মধ্যে। প্রথম পক্ষে লীগের প্রাদেশিক সম্পাদক আবুল হাশিম, আর দ্বিতীয় পক্ষে ঢাকার নবাববাড়ীর খাজা নাজিমুদ্দিন—সেলিমরা। লীগের ঢাকা জেলা কমিটির সম্পাদক শামসুদ্দিন আহমেদ ছিলেন প্রগতিশীল গ্রুপের অন্যতম প্রধান সংগঠক। খুব সম্ভব অন্নদা পালের সাথে তিন একদিন এসে হাজির পাটুলীতে। তাঁর সঙ্গেই নেমে পড়লাম সম্মেলনের কাজে। এ উপলক্ষ্যে পরিচয় ঘটে জনাব আবুল হাসিম এবং শামসুল হক সাহেব প্রভৃতির সঙ্গে। হাশিম সাহেব ছিলেন তুখোড় বক্তা এবং ইসলামী শিক্ষায় সুপণ্ডিত। মুসলীম লীগার হলেও অসাম্প্রদায়িক এবং ইসলামী সমাজতন্ত্রের ধারণায় ছিলেন তিনি দৃঢ় আস্থাবান। কোরান—হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সমাজতন্ত্রের এক ধরণের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন তিনি তাঁর নিজস্ব কায়দায়। তখনই তিনি চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। ছোটখাট মানুষ। কিন্তু তাঁর দেহরক্ষীটি ছিল বিশালদেহী, মাথায় কাশ্মিরী (জিন্না) টুপিধারী এক অবাঙ্গালী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শামসুদ্দিন সাহেব রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও আমৃত্যু শামসুল হক সাহেব ছিলেন খুবই সক্রিয়। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আওয়ামী মুসলীম লীগ সংগঠনটির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা এবং ঐ দলটির প্রথম সম্পাদক। মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে টাঙ্গাইল থেকে পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় নির্বাচিত তিনিই প্রথম বিরোধীদলীয় এম এল এ। শেষ জীবনটা ছিল তাঁর খুবই বেদনাদায়ক। শুনেছি মৃত্যুর আগে তিন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

চালাকচর সম্মেলনের পর থেকে অন্যান্য সাংগঠনিক কাজে আরো অনেক বেশী জড়িয়ে পড়ি। পাটুলী গ্রামকে কেন্দ্র করে মুলতঃ কৃষক সমিতি গড়ে তোলার কাজে নামি। তখন থেকে কালিদা—অন্নদা পালের বদলে নিয়মিত (মাসে অন্ততঃ একবার) ঢাকা থেকে পাটুলীতে আসতেন বিনয় বসু। সে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু কালিদা—মোহিত রায়—অন্নদা পালের হাতে, তা আরো তীব্রতর হতে থাকল বিনয়দার কাছে। তিনি ছিলেন অগ্নিযুগে ঢাকা শহরের প্রখ্যাত বিনয়—বঙ্গেশ্বর জুটির একজন, পরে কমিউনিষ্ট পার্টির ঢাকা জেলা কমিটির অন্যতম সংগঠক এবং কৃষক নেতা। এ সময় মাঝে মাঝে পাটুলীতে আসতেন ছাত্র ফেডারেশান নেতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র দেবপ্রসাদ মুখার্জী। বয়স, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় তাঁদের সঙ্গে আমার ছিল বিরাট ব্যবধান। তবু কখনও কোন অসুবিধে বোধ করতাম না। আমার ন্যায় কনিষ্ঠদের প্রতি তাঁদের সহজ সরল ব্যবহার গুণেই তা সম্ভব হয়েছিল।

পাটুলী — পোড়াদিয়া — চালাকচর—মনোহরদি অঞ্চলের বাইরেও এ সময় কখনও কখনও সভা সমিতি ও অন্যান্য কাজে যেতাম। যেমন, মিছিল নিয়ে নারায়ণগঞ্জে পিসি যোশীর (সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টির তখন সাধারণ সম্পাদক) সভায় এবং মঠখোলাতে অষ্টমী স্নানের মেলায় ভলান্টিয়ার দল নিয়ে যোগদানের কথা এখনও মনে আছে। ঢাকা—নারায়ণগঞ্জের এক বিস্তৃত নির্বাচনী এলাকা থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্যপদপ্রার্থী, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী, এ উপমহাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিখ্যাত

শ্রমিক নেতা গোপাল বসাকের পক্ষে প্রচারে ঢাকা জেলার উত্তরাঞ্চলে অনেক গ্রাম—গঞ্জেও গিয়েছি পাটুলী থেকে। দিন ১০/১৫ মাইল হাঁটা বা সাইকেলে ২০/২৫ মাইল যাওয়া ছিল একদম সাধারণ ব্যাপার।

এ নির্বাচনের প্রচার উপলক্ষ্যে পোড়াদিয়াতে এক জনসভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা থেকে আসবেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা নেপাল নাগ এবং জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ফনি গুহ। তাঁদের আনতে একাই গেলাম পাটুলী থেকে মেথিকান্দা স্টেশানে। ট্রেন এসে থামল। একটি লাল ঝান্ডা নিয়ে আমি একা দাড়িয়ে প্লাটফর্মে। নেতারা দেখতে পেলেন। বললেন গাড়ীতে উঠে পড়তে। তাঁদের সঙ্গে চলে গেলাম ভৈরব। সেখান থেকে নৌকায় রওয়ানা হলাম পোড়াদিয়ার পথে। নদীতে তখন তেমন পানি নেই। প্রায় সারা দিন লেগে গেল পাটুলীর ঘাটে পৌছাতে। এখানে এসে জানা গেল যে স্থানীয় মুসলীম লীগ নেতাদের "প্রতিক্রিয়াশীল" অংশের বিরোধীতার কারণে পোড়াদিয়াতে সে সভা করা যাবে না। তাই স্থির করা হলো সভা হবে পাটুলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। সভাটিতে লোক সমাগম হয়েছিল প্রচুর। নেতাদের সঙ্গে আমাকেও বলতে হলো। এই প্রথম জনসভায় বক্তৃতা।

ক্রমে স্থানীয় মুসলীম লীগ নেতাদের বিরোধীতা তীব্রতর হতে শুরু হলো নানাভাবে। আমি চিহ্নিত হয়ে পড়লাম তাদের প্রধান টার্গেট হিসেবে। জীবনাশঙ্কা দেখা দিল। এক দিনতো পোড়াদিয়া বাজারে হাটের দিন বক্তৃতা দেওয়া অবস্থায় গুন্ডাদের নিশ্চিত আক্রমণ থেকে বাঁচালেন মোহিত দা। তারপর ঐ অঞ্চলে আমার অবস্থান আর নিরাপদ থাকলো না। বিনয় দা'র পরামর্শে তাঁর এক চিঠি নিয়ে চলে গেলাম কিশোরগঞ্জে। পথে অবশ্য কয়েকদিন ছিলাম চালাকচরে । ওখানে থেকে সাইকেল চালিয়ে কিশোরগঞ্জে এসে পৌছালাম সম্ভবতঃ ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসের কোন একদিন। ঠিক হলো, আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবো। কিন্তু সে জন্যে প্রয়োজন একটি ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে পোড়াদিয়ায় যাওয়া ছিল অসম্ভব । দেবপ্রসাদ দা'র পরামর্শ ও সহায়তায় ঢাকাস্থ জেলা শিক্ষা বোর্ড থেকে একটি ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে গেলাম। এভাবে অনেক পথ ঘুরে আবার বাড়ির সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগের আওতায় চলে এলাম ১৯৪৬ সালে।

আমার এ লেখা পড়ে কেউ কেউ হয়ত বিরক্ত হবেন এই কথা ভেবে যে, একজন প্রবীন শিক্ষক হয়েও স্মৃতিচারণের সুযোগ নিয়ে আমি ছাত্রছাত্রীদের প্রকারান্তরে "রাজনীতি" করতে উৎসাহিত করছি। অনেকেই ছাত্র এবং শিক্ষকদের স্ব স্ব পেশার পরিসীমায় আবদ্ধ থাকতে এবং কোনরূপ রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক মুখর এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদরা, যাঁরা নিজ নিজ মুল পেশাতে (ডাক্তারী, উকিলগিরি, ব্যারিস্টারী প্রভৃতি) নিজেদের আবদ্ধ রাখতেন না এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ন্যায় জটিল বিষয়ে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন না করেও "রাজনীতি চর্চায়" চলে এসেছেন, এম, পি—মন্ত্রী প্রভৃতি হয়ে হঠাৎ করে দেশের রাজনৈতিক প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়নের গুরু দায়িত্ব বহন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করছেন না। স্ববিরোধীতা এবং আত্ম প্রবঞ্চনা ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে? মুলতঃ এ জাতীয় ব্যক্তি বর্গের প্রচারের ফলেই রাজনীতির মতো জাতীয় জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টি আজ প্রায় একটি অশ্লীল শব্দে পরিণত হয়েছে। মজার বিষয় হলো, তাঁরা মুখে যা—ই বলুন, স্বীয় ব্যক্তিস্বার্থ সহায়ক "রাজনীতি" চর্চায় ছাত্রদের তো বটেই, এক শ্রেণীর শিক্ষকদের ব্যবহার করতেও কুন্ঠা বোধ করেন না। যাক এ প্রসঙ্গ।

আমি যা বলতে চাই তা হলো এই যে, মানুষের জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের চাইতে কোনভাবেই কম গুরুত্বপূর্ন নয় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা । আর তার রয়েছে বহুরূপ, অর্জনের পদ্ধতিও বহুবিধ। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণও এর একটি রূপ। অবশ্য এটিই একমাত্র রূপ বা পদ্ধতি নয়। আর সকলের ক্ষেত্রে এটি সমান ফলপ্রদ না—ও হতে পারে ন। এক যাত্রায় ভিন্ন ফল লাভও সম্ভব। কেননা, মিলের মধ্যে অমিলই জীবজগত তথা মানব জাতির

বৈশিষ্ট্য। এ প্রেক্ষিতে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে বিচার করলে খুশী হব। অতিক্রান্ত জীবনের দিকে তাকালে আমার মনে হয় যে, বর্ণিত যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, তা ব্যতিরেকে আমার জীবন হতে পারত সম্পূর্ন অন্য ধরনের। শিক্ষা জীবনের শীর্ষে পৌছানোর এবং শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেবার ক্ষেত্রে উক্ত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাই আমাকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছিল। আর যে জীবনবোধ বা জীবনদর্শনকে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তার প্রায় সবটুকুর জন্যেই আমি ঋণী আজীবনব্যাপী অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার কাছে । এর শুরু হয়েছিল পোড়াদিয়া অঞ্চলের অজ পাড়া গাঁয়ে। তাই সেখানকার স্মৃতি অমৃত্যু জাগরুক থাকবে আমার মনে।

বিগত পঞ্চাশ বছরে দেশে ও বিদেশে অভূতপূর্ব বেগে এসেছে কাংখিত—অনাকাংখিত বিপুল পরিবর্তন, যা এক সময় আদৌ ঘটবে বলে ভাবা যেত না। যেমন, আমাদের মাতৃভূমিতে মহাশক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এবং পাকিস্তানী জামানার অবসান হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঙ্গালী জাতির স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। অন্যদিকে প্রায় দেড় শতাধিক বর্ষব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে গড়ে ওঠা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক জগৎটি আজ আর নেই। এ লেখায় উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের অনেকের জীবনকে এই ব্যাপক পরির্তন স্পর্শ করেছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের জন্য তাঁদের মধ্যে যাঁরা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছিলেন, তাঁদের অনেকের পক্ষে "স্বাধীন" পাকিস্তানে নিরাপদে বাস করা সম্ভব হয়নি মূলতঃ অন্য সম্প্রদায়ে জন্ম বলে এবং তখনকার "শিশু পাকিস্তানের" ভাবাদর্শ সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মতাবলম্বী হবার কারণে। তাঁদের অনেকেই দেশান্তরী হলেন, যেমন—কালিদা, অন্নদাবাবু এবং মোহিতদা। আর যাঁরা দেশে রয়ে গেলেন, তাঁদের যেতে হলো আত্মগোপনে, যেমন নেপালদা, ফনিদা, বিনয়দা। আত্মগোপন অবস্থার শুরুতে গ্রেপ্তার হলেন ফনিদা (১৯৪৭) এবং বিনয়দা (১৯৪৮) । বৃটিশ আমলেও রাজবন্দীদের ওপর যে ধরণের শারীরিক নির্যাতন করা হয়নি, তেমন অমানুষিক নির্যাতনে ময়মনসিংহ জেলে নিহত হলেন ফনিদা। একইভাবে অত্যাচারিত বিনয়দা বাধ্য হলেন জেল থেকে বের হবার পরপরই দেশ ছেড়ে চলে যেতে। অবশ্য নেপালদা এদেশেই আত্মগোপনে ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে গোপনে দেশ ত্যাগ করেন। কয়েক বছর আগে কলকাতায় প্রথম বিনয়দা এবং সম্প্রতি নেপালদার মৃত্যু হয়েছে। দেব প্রসাদ মুখার্জী বর্তমানে কলকাতার এক জন প্রখ্যাত আইনজীবি। কালিদা বিহারে কোন এক স্থানে "শ্রেণী শত্রুদের" হাতে নিহত হয়েছেন বলে তাঁর একজন সহকর্মী ১৯৭২ সালে পত্রযোগে আমাকে জানিয়েছিলেন। মোহিত দা চলে গিয়েছিলেন মেঘালয় বা আসামে এবং অন্নদা বাবু ত্রিপুরাতে। তাঁদের আর কোন খবর আমার জানা নেই।

রোমন্থন

সোহরাব উদ্দিন আহম্মেদ
উপ–সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়

১৯৫১ সালে আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুলে ভর্তি হই। এর আগে গলগলিয়া প্রাইমারী স্কুলে। তখন পঞ্চম শ্রেণী উচ্চ বিদ্যালয়ের অংশ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নয়।

আমার ক্লাশে প্রায় ৩০/৩৫ জন ছাত্র ছিল। চেয়ারম্যান কাঞ্চন, হেডমাষ্টার শহীদুল্যাহ ভূইয়া, শিক্ষা অফিসার শামসুল হক, মনোরঞ্জন দাস (জন্টু), প্রফুল্ল চন্দ্র শীল (পঁচু), শাহাবউদ্দিন, জয়দেবপুরের আব্দুল ওহাব, জামালপুরের শামসুল হক, রশিদ (বর্তমানে পশু ডাক্তার) এঁরা ছিলেন আমার সহপাঠী। আমাদের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন কসবার স্বর্গীয় দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস। তিনি শুধু অংকের শিক্ষকই ছিলেন না।, ছিলেন অংকের একজন দিগগজ— পারদর্শী। আমার প্রতি তাঁর খুবই দূর্বলতা ছিল। কারণ আমারও অংক ভাল লাগত। হেডমাষ্টার ছিলেন স্বর্গীয় কামিনী মোহন বর্মন। তিনি ইংরেজী পড়াতেন। আমার প্রতি তাঁরও খুব দুর্বলতা ছিল। এখানেও তাঁর বিষয়ের প্রতি আমার মনোযোগই তার কারণ।

একটা গরীব পরিস্থিতিতে একটা হাই স্কুলের মত প্রতিষ্ঠান চালান যে কেমন কষ্টকর তা ভুক্তভোগীরাই ভালভাবে জানেন। ছাত্রের সংখ্যা কম, বেতন রীতিমত আদায় হচ্ছেনা । ফলে শিক্ষকদের বেতন দেয়া যাচ্ছে না। শিক্ষক থাকছে না।

এসব সমস্যা ছাড়াও দরিদ্র পরিবেশে ব্যবস্থাপনার সংকট থাকেই। একে অপরকে এবং সমস্যাটিকে বুঝতে চায়না। ফলে ঝগড়া বিবাদের হয় শুরু।

এমনিভাবে আমাদের স্কুল তখন দিন কাটাচ্ছিল। অষ্টম শ্রেণীর পরই আমি হাতিরদিয়ায় চলে যাই । সেখানে থেকেই ১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করি।

আজ শিক্ষার প্রতি সর্বত্রই একটা অনুভূতি দেখা যাচ্ছে। আমরা যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি তখন অবস্থা এমন ছিলনা। বলতে গেলে আমাদের বাংলাদেশী অঞ্চলের লোকদের মধ্যে শিক্ষা, নাগরিক অধিকার, উন্নয়ন—এসব ধারণা জন্ম হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর। প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪—১৮) পাটের দর বেড়ে গেলে পূর্ব বাংলার কৃষকদের হাতে কিছু বাড়তি অর্থ জমে। তখনই তারা তাদের ছেলেমেয়েদের কিছু শিক্ষার কথা ভাবতে থাকে। এভাবেই বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবণতা জাগে। শুরু হয় স্কুল কলেজ স্থাপনের পালা। আমাদের পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুলও এসময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়।

উন্নত মানের শিক্ষা ছাড়া কোন ব্যক্তি, সমাজ বা দেশ এগুতে পারে না। এজন্য শিক্ষার মান বাড়ান দরকার। কিন্তু এদিকে আমাদের নজর খুব কম। আমাদের স্কুল কলেজ থেকে যারা বের হয়ে আসছে তারা খুব উন্নত মানের শিক্ষা পাচ্ছেনা। ফলে জীবনের সমস্যা উপলব্ধিতে এবং অন্যান্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় আমাদের অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়ছে। এর বিহিত করা দরকার। এ দায়িত্ব আমাদের অঞ্চলের সবার। আমরা কি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারব?

মানুষের মাঝে অসীম সম্ভবনা লুকিয়ে আছে। শিক্ষার মাধ্যমে তা জাগান যায়। একজন অতি সাধারণ ছাত্র একজন কৃতি প্রকৌশলী/ ডাক্তার/বৈজ্ঞানিক/কৃষিবিদে পরিণত হতে পারে। দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারে। তখনই হয় দেশের জন্য প্রকৃত সুদিন।

আমরাও কি এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার মাধ্যমে একটি দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরিত করতে পারব? চেষ্টা করলে অবশ্যই পারব। আমরা এমন চেষ্টা করব কি?

আরো একটি বিষয়ের উপর আমি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। নৈতিকতার উন্নত ভিত্তি ছাড়া কেউ এগুতে পারে না। শিক্ষা এবং শিক্ষালয়ের একটি পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে নৈতিকমান উন্নীত করা। এদিকে আমাদের স্কুল কলেজগুলিতে এখন মারাত্মক ঘাটতি আছে। নকল, অসাধুতা এবং নোংরামি এখন শিক্ষালয়ের পরিস্থিতি বিষয়ে তুলছে। ফলে মিথ্যাচার, দুর্নীতি আর সাংস্কৃতিহীনতায় দেশ তলিয়ে যাচ্ছে। এ সর্বনাশা পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য নৈতিকতার উন্নত আদর্শ স্কুল কলেজে পুন প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। এখানে কোন মিথ্যাচার নয়, কোন অন্যায় বা মিথ্যার স্থান নয়। সততা, নৈতিকতা এবং ন্যায়পরায়নতার মহাদর্শে সমাজকে দীক্ষিত করার নামই শিক্ষা।

অন্য এক রকম স্মৃতিচারণ

মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
সহকারী অধ্যাপক, ফসল উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি ইনষ্টিটিউট, ঢাকা

আমারও এই স্কুলে পড়বার কথা ছিল। আমার বাবা চাচা যেমন পড়েছেন। আমার ভাই বোন যেমন পড়েছে। তারই প্রস্তুতি হিসেবে হাই স্কুল সংলগ্ন লম্বা প্রাইমারী স্কুলে তখন পড়তাম। বাবা থাকতেন ঢাকায়। শিক্ষকতা করতেন প্রাইমারী স্কুলে। আমি থাকতাম মা আর দাদীর সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে। মহা সুখে ছিলাম তখন। কখনো স্কুলে যেতাম কখনো যেতাম না। বেশ স্বাধীন। বই নিয়ে বেড়িয়েও বাতেনের (আবদুল বাতেন খন্দকার) সঙ্গে বহুদিন কাটিয়েছি গাছের ডালে আর জমি জমার আইলে বসে। অপেক্ষা করেছি কখন স্কুল ছুটি হলে পরে সবাই ঘরে ফিরবে। সে সময় আমিও বাড়ি ফিরতাম আর সকলের সঙ্গে। ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে খাওয়া সারতাম, যেন মহা কাজ সেরে এসেছি স্কুল থেকে। মা বুঝতেন খাওয়া হলেই বাইরে বেড়ুবো খেলতে। মা তাই আগে ভাগেই বলে দিতেন খেয়ে যেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়তে। মাকে দেখিয়ে ঠিক যেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিতাম। মার তখন হাজারো কাজ। মা একটু অন্য কাজে মন দিলেই গুটিসুটি পায়ে বেড়িয়ে পড়তাম ডাংগুলি (ছুতি মুতারী) লুকিয়ে নিয়ে। সন্ধ্যা তার অন্ধকার চাঁদর দিয়ে চারপাশ ঢেকে দিলে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ভেজা বেড়ালের মত বাড়ি ফিরতাম। রাজ্যের দুঃশ্চিন্তা সে সময় মাথায়। মায়ের বকুনী খাবার ভয় তার অন্যতম।

চুপচাপ এসে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে সুবোধ বালকের মত বসে যেতাম পড়ার টেবিলে। হারিকেন আনতে যেয়ে যদি মার হাতে ধরা পড়ি সে ভয়ে কুপির আলোতেই পড়তে বসতাম। সন্ধ্যার সময়টাতেই আমি নিয়মিত পড়তে বসতাম। সে যতটা না পড়ার টানে তার চেয়েও হাজার গুণ মায়ের বকুনি আর বেতের ভয়ে। পড়তাম বেশ জোরে সোরে। মাকে শুনাতাম আমি বেশ ব্যস্ত পড়াশুনায়। ভীষণ ক্ষুধা পেটে কিন্তু খাওয়ার যেন ফুরসৎ নেই। অথচ আমি জানি কি সিরিয়াসলি অপেক্ষায় থাকতাম কখন মা খেতে ডাক দিবেন।

তো এই রকম চলছিল আমার পড়াশুনা সে সময়। ক্রমশই দুষ্টের রাজা হচ্ছিলাম। পড়াশুনা হয়ে পড়ছিল একটি ভীতিকর বিষয় আমার কাছে। ভবিষ্যত আমার ক্রমশই মহা ঝরঝরে হয়ে উঠছিল। ছুটিতে বাড়ি আসতেন বাবা। প্রচুর খেলনা নিয়ে। পড়াশুনা ধরার খুব একটা সময় পেতেন না। ভীষণ ব্যস্ত সময় কাটতো তাঁর সংসারের নানা কাজ নিয়ে। এ রকমই কেটে যেতে পারতো আমার বহু দিন। কিন্তু তা হলো না। সেটিই মূল কারণ পোড়াদিয়া হাই স্কুলের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদের।

তখন ফোর—এ পড়তাম। পড়ার উন্নতি আগের মতই। বাবা আসলেন রোযার ছুটিতে বাড়িতে। কি মনে করে আমাকে সব বই আনতে বললেন। আমি অনুমান করলাম ভয়ংকর একটা কিছু অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। বই পত্র নিয়ে এলাম। বাবা বাংলা বই থেকে দু'চারটে প্রশ্ন ধরলেন। তাতেই আমার জ্ঞানের রহস্য ধরা পড়ে গেল তাঁর কাছে। ইংরেজীর এটা ওটা জানতে চাইলেন। বলতে পারলাম না। পাটিগণিত কষতে দিলেন ক'টি। অর্ধেক হলো তো বাকী অর্ধেক করতেই পারলাম না। বাবা আমার পড়াশুনার উন্নতি দেখে বেশ আৎকে উঠলেন। আমি তাঁকে কখনো আর এতটা বিচলিত হতে দেখিনি। বলা বাহুল্য সেবার প্রচুর বেত পড়লো আমার পিঠে। হয়তো তাতে আমার পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়ে থাকবে। আজ তাই মনে হয়।

বাবা অনেকটা হঠাৎ করে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে বেলাবতে প্র্যাক্‌টিস শুরু করবেন। বাবার সে সময় হোমিওপ্যাথ লাষ্ট পার্টটাও শেষ হয়ে গেছে। তাই করলেন তিনি। প্র্যাক্‌টিস শুরু করলেন বেলাবতে চাকরী ছেড়ে এসে। বাড়ি থেকে অনেকটা জোর করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন আমাকে। সেই থেকে দাদী আর মার কাছে থাকার সুযোগ নষ্ট হলো। সেই থেকে পোড়াদিয়া হাই স্কুলে পড়ার রাস্তা আমার বন্ধ হলো।

এইভাবে আমি পরিচিত অংগন থেকে ছিটকে পড়লাম দুরে। পেছনে পড়ে থাকলো আমার সব সহপাঠি, সঙ্গি সাথী। পড়ে থাকলো আমার ছেলেবেলার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বাতেন। দাদা—দাদী, মা সবাই। পড়ে থাকলো ফুল কুড়ানোর বেলা। সেই সে নদীর পাড়ের বকুল গাছের ফুল কুড়িয়ে সার্ট আর

হাফ প্যান্টের পকেট ভরতাম। ভরা নদীতে পাল তুলে এসে হাজারো নৌকো ভিড়তো পোড়াদিয়ার ঘাটে। কি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম এসব নৌকো আর নৌকোর সব লোকজনদের দিকে। কোথা থেকে আসে এসব নৌকা, কত দূর এসব লোকজনের আবাস, কোথায় যাবে এসব নৌকো আবার। সে সব প্রশ্নের জবাব পাবার আগেই বাবা আমার কৈশরের লাগামহীন জীবনটায় বেশ করে লাগাম টেনে ধরলেন। ভবঘুরে ধরনের জীবনে আমার নিয়মের কঠোর আইন চালু হলো। অলিখিত সে আইন কিন্তু না মেনে উপায় নেই। বাবার রক্তচক্ষু, বাশের কঞ্চি সব মিলে আমাকে একেবারে সিরিয়াস ছাত্র বানিয়ে দিলো। ভীষণ দুঃখ হলো কেন এতদিন পড়াশুনাটা করিনি। ভীষণ রাগ হলো মায়ের উপর। মা নিশ্চয় কষে বেত মাড়লে তাঁদের সঙ্গ আমাকে ছাড়তে হতো না। পরিচিত অংগন, বন্ধু বান্ধব সবই পড়ে থাকলো পোড়াদিয়ায়। আমি কেবল বন্ধু বান্ধবহীন, নতুন এক পরিবেশে যেন এক নতুন অতিথি।

প্রাইমারী ছেড়ে হাই স্কুলে ঢুকে পড়লাম অতপর। কিন্তু পোড়াদিয়া হাই—এ আর পড়া হলো না। ততদিন মা ও থাকছেন আমাদের সঙ্গে বেলাবতেই। তবু স্কুল বন্ধ হলে ক'দিনের জন্য ঠিক ছুটে আসতাম দাদা দাদীর কাছে। যাবার পথে মাঠে পেরুতে গিয়ে বার বার তাকিয়ে দেখতাম স্কুলটিকে। প্রশস্ত মাঠ পেরিয়ে এল ধরনের স্কুলটা তখন আমাকে খুব টানতো। আমি দেখতাম আর মাঠ পেড়ুতাম।

এই স্কুলে যারা পড়তো একই ক্লাশে তাদের অনেকের সঙ্গে আমার ছিল গভীর ভাব। কখন কি পড়ানো হচ্ছে, কোন স্যার কি পড়ান—কেমন করে পড়ান সবই শুনে নিতাম আমি গল্পের ছলে। স্যারদের কত রকম মজার মজার কথা যে বলতো আমার বন্ধুরা। বাতেন তো বগাদি —এর লম্ব এক স্যারের কথা বলতে বলতে প্রায় অজ্ঞান হতো। খুবই রসিক স্যার। কথা বলেন একটু ভিন্ন রকম করে। সেটিই আমাদের শুনবার বিষয় বস্তু। কথা কথা কত ভাব এভাবে বিনিময়ময় হয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে। স্কুলের প্রশস্ত সবুজ মাঠে এরকম হাজারো গল্পে মেতেছি আমরা। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়াছি এখানে। এভাবে মাঠের মমতা আমাকে বেঁধেছে।

ক্লাশ করা হয়নি কখনো এই স্কুলে। তবু বহুবার এর বেঞ্চিতে বসেছি। কত সন্ধ্যায় বেঞ্চকে তবলা করে তুড়ি মেরে সময়কে পাড় করে দিয়েছি। এর বারান্দায় বসে কত বৃষ্টিকে আড়াল করেছি। হাজী চাচার পোষ্ট অফিস কক্ষে বসে কত কথার ঝড় তুলেছি। এভাবেই এই স্কুল আমার কাছের হয়েছে।

বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষককেই আমি চিনতাম তখন। তাঁদের অনেকেই আমাকে বেশ স্নেহও করতেন। দু' একজন সস্নেহে হাত রাখতেন আমার পিঠে। এটা ওঠা জিজ্ঞেস করতেন। পড়াশুনা কেমন হচ্ছে জানতে চাইতেন। নানা রকম প্রশ্ন ধরতেন, কত রকম উপদেশ দিতেন। এইভাবে আমি তাঁদের কাছাকাছি এসেছি। তাঁদের এক জনের বাড়ী ছিল ব্রাহ্মনের গাঁও—এর দিকে। তাঁকে আমি ঐদিকে যেতে দেখতাম স্কুল ছুটি হলে। খাটো গড়নের মোটা সোটা শ্যামলা রংগের ছিলেন তিনি। পান খেতেন বেশ, ছাত্ররা বাজার থেকে মাঝে মধ্যে খিলি পান এনে দিতেন তাঁকে। আমাকে দেখলেই দু'চার মিনিট এটা ওটা জিজ্ঞেস করতেন। কারো কাছে শুনেছেন যে আমি জুনিয়ার স্কলারশীপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। এর পর থেকে তাদের সস্নেহ আদর আরো বেড়েছে আমার প্রতি। এ ভাবেই দূর থেকে আমি অনেক শিক্ষকের কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছি। এ ভাবেই এই স্কুল ও আমার আপন হয়েছে।

পোড়াদিয়া স্কুলের পরিচিত অংগনে আমার আসা যাওয়া কখনো থামেনি। এমনকি যখন কলেজে পড়েছি কিংবা ভার্সিটিতে পড়েছি তখনও বাড়ি এলেই ছুটে আসতাম এই অংগনে। এখানকার মাঠের শেষের নদীর পাড়, বকুল গাছের লম্বা লম্বা শেকড়, নদী পাড়ের সবুজ মাঠ, আম কাঠাল গাছের কর্তিত কান্ড, স্তুপে স্তুপে জমিয়ে রাখা বাঁশ এসবই আমাদের বসার স্থান হয়েছে। কত কত দিন রাত বসেছি স্কুলের ছাদে। বিকেলের আলোয় বসে কত কত দিন বিস্তৃত খোলা মাঠের সবুজকে অনুভব করেছি। কত দিন শেষ বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ায় জুড়িয়ে নিয়েছি তনু মন। মাঠের সবুজ ঘাসের আস্তরণে বসে কত কত সন্ধ্যাকে পৌছে দিয়েছি রাতের মাঝ ভাগে। কাজলের ডাঃ আজিজুল হক সঙ্গে বসে বসে কত কথার ঝড় তুলেছি। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়েছি কত দিন। ঘাসের ডগায় হাত রেখে এর আশ্চর্য সজীবতাকে স্পর্শ করেছি। এর প্রাণের উদ্ভাস মেখে নিয়েছি সারা দেহে মনে। এভাবেই এই মাঠ, এই বৃহৎ অংগন, আঁড়িয়াল খাঁ নদী, বকুল আর আম কাঠালের গাছ আর ধাতই গাছের সারি আমার নিজের হয়েছে। এরা এক হয়ে মিশে আমার সত্তার অংশ হয়েছে। আমার মানসপটে বিরাট ক্যানভাসে আঁকা এক জলছবি হয়েছে। আশ্চর্য বিনে সুতোর এক বন্ধন হয়েছে। বন্ধনহীন বন্ধন। অদৃশ্য কিন্তু গভীর। অচ্ছেদ্য, অবিচ্ছেদ্য।

পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুলের সৃষ্টির কিছু ইতিহাস

মোঃ শহীদুল্লাহ ভূইয়া
চেয়ারম্যান—বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ

সময়টা ছিল বৃটিশ শাসনামল। দীর্ঘদিন উপনিবেশিক শাসন ও শোষণে উপমহাদেশের মানুষ নির্যাতীত ও নিষ্পেষিত। সুদীর্ঘ সময়ে ইংরেজ শাসন দন্ডের অত্যাচার ও নিষেপশনের যাতাকলে পিষ্ঠ হয়ে দেশের মানুষ যখন দিশেহারা তখন দেশ প্রেমিক রাজনৈতিক নেতা কবি, সাহিত্যিকদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী চেতনার বিকাশ ঘটে এবং সারা ভারতবর্ষে তখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ইংরেজ খেদাও আন্দোলন তীব্রতর হতে শুরু করে। সেই মূহুর্তে মনোহরদী (সাবেক) থানার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত পোড়াদিয়ার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল থমথমে। রাজনৈতিক অবস্থা ছিল তুঙ্গে। বামপন্থী বিপ্লবী মূর্চা গঠন করে চলছে এর আশে পাশের গ্রামগুলোতে। এই অজ পাড়াগাঁয়ের আশে পাশেই অনেকেই টেরোরিষ্ট মডম্যান্টে যোগদান করে এবং অনেককে কারাবরণ করতে হয় এবং অনেক বিপ্লবীদের আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। অনেক বিপ্লবী আত্মগোপন করে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতেও পিছপা হয়নি। পাটুলী ইউনিয়ন ও চালাকচর ইউনিয়নের বহু রাজনৈতিক নেতা তখন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে স্বাধীনতার ইতিহাসে উজ্জল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। সময়টা ছিল ১৯৩০ সনের গোড়ার দিকে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুন্ঠন এবং ইউরোপিয়ান ক্লাব দখলের মত সন্ত্রাসী তৎপরতা ইংরেজ শাসনকে পর্যুদস্ত করার উপক্রম হয়েছিল।

শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন স্বাধীনতা ছিলনা। সমাজের মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। একদিকে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী গভর্ণর জেনারেলের মাধ্যমে রাজদন্ড চালিয়ে যাচ্ছিল কঠোর হস্তে। অন্য দিকে মহাজনী চক্রবৃদ্ধি শোধের ব্যবসা চাপিয়ে দিচ্ছে গরীব কৃষকের উপর। এত অত্যাচার ও নিষেপষণ থাকা সত্বেও সেই যুগে মানুষের মনে প্রাণে ছিল অঢেল আনন্দ ও উচ্ছাস। সমাজে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতির এতটুকু শিকড় তখনও গজাতে পারেনি। আইন শৃংখলার প্রতি মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। খাওয়া—দাওয়া ও চিত্ত বিনোদনের কোন অভাব ছিল না। সেই সময়ে লোক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে দেশের সাধারণ মানুষের অনবদ্য ছবি। পাখীর কলকাকলিতে, খোলা আকাশের নীচে দিগন্ত প্রসারী সবুজ মাঠের উদাসী হাওয়ায় ধানের সবুজ পাতার ছন্দময় আন্দোলনে সরল পল্লীবাসীর মনে ভাবের যে লীলা চলছে তাতেই সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য গীতি কবিতা, কিসসা—কাহিনী, পুঁথিপত্র, ছড়া, হেঁয়ালী, মারফতী, ভাটিয়ালী, জারী প্রভৃতি অগনিত সাহিত্যের চমৎকার নিদর্শন। তাছাড়া যাত্রাগান, লাঠিখেলা, ছিখেলা বা হাডুডু, ঘোড়দৌড়, গরু দৌড়, কুস্তি, গোল্লাছুট ইত্যাদি খেলাধুলায় জগৎকে মাতিয়ে তুলেছিল। গ্রামের মানুষ গান বাজনা ও খেলাধুলায় আকৃষ্ট ছিল। এমন গ্রাম বড় একটা খুঁজে পাওয়া যেত না যেখানে গান বাজনার চর্চা ছিল না। লাঠি খেলা ও ফুটবল খেলার খুবই ধুমধাম ছিল। লেখাপড়ার চর্চা বলতে মোটেই ছিলনা। মনোহরদী থানার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মকতব ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তখন ছিলনা। শিক্ষা দীক্ষায় সমাজ তখন ছিল গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। সারা ভাওয়াল পরগনায় হাতে গোনা কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। কোন গ্রামেই ২/১ জন শিক্ষিত লোক পাওয়া কঠিন ছিল। শিক্ষিত লোক যা ২/১ জন ছিল তাও কলকাতা ও ঢাকা শহরে সরকারী পর্যায়ে চাকুরীরত অবস্থায় নিয়োজিত। শিক্ষিত হিসাবে গ্রামে যারা ছিল তারা শিক্ষকতার মহান পেশায় ব্রতী ছিল। হিন্দু জমিদারদের সন্তান ও বনেদী হিন্দু—মুসলিমদের মধ্যে যে ২/১ ঘর শিক্ষার আলো পেয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল শিক্ষানুরাগী এবং কেউ কেউ শিক্ষকতাকে সর্বাধিক সম্মানের চাকুরী বা সেবামূলক

আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়েছিল। লেখাপড়া করাটা সমাজে একটি দুরহ ব্যাপার ছিল। নিরক্ষরতা একটা জাতির ভাগ্যে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। অশিক্ষার আঁধার ব্যক্তি জীবনকে যেমন আচ্ছন্ন করে রাখে, জীবনের বিকাশের কোন পথ সেখানে থাকেনা। সমাজ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত সে সময় জনৈক শিক্ষক মরহুম ইলিয়াস মিয়ার অনুপ্রেরণায় পোড়াদিয়ার উত্তরে মুগা নিবাসী মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া শিক্ষার প্রদীপ হাতে নিয়ে উদয় হলেন পোড়াদিয়ার লাল মাটিতে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার অদম্য স্পৃহা, উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নিজে ব্রতী হলেন এ মহৎ কাজে যা তখন চিন্তা করাই একটা দুরহ ব্যাপার ছিল।

কাঠালের সারি সারি বাগান আড়িয়াল খাঁ নদীর পশ্চিম তীরে বকুল বৃক্ষ ও প্রশস্ত আম গাছের সারি, চার পাশের দাঁতই বন ও সবুজ প্রান্তর সব মিলিয়ে প্রাকৃতিক এক অনিন্দ্য সুন্দর পরিবেশ বিরাজমান ছিল। এমনি এক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আব্দুল হামিদ ভূইয়া এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে বিরাট জনসমাবেশ ডাকলেন। সেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুল গড়ার। এতে হিন্দু—মুসলিম সকল স্তরের মানুষের সমর্থন পেল। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও মুসলিম গৌরবের বিরল ঘটনাটি ছড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে শুরু হ'ল বাড়ী বাড়ী গিয়ে অর্থসংগ্রহ। স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে অনেক উন্নয়ন কাজ চলতে আরম্ভ হ'ল। প্রতিযোগিতা শুরু হল দাতা সদস্যের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হওয়া। স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে উদার হস্তে জমি দান করলেন মরহুম সোনাউল্যা মৃধা। তিনি বিপুল ভূ—সম্পত্তির মালিক ছিলেন। অনেকেই জমি দান করেন। আব্দুল হামিদ ভূইয়া স্কুল প্রতিষ্ঠা করার দুর্বার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এলাকার গণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন অর্জন করেন। তিনি হাজার হাজার লোক নিয়ে নিজ বাড়ী হতে বড় ঘরটি ভেঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড় করালেন পোড়াদিয়া বাজার সংলগ্ন মাঠের এক প্রান্তে। অতপর আব্দুল হামিদ ভূইয়া পাটুলী ইউঃ বিন্নাবাঈদ, বাজনার ও বড়চাপা ইউঃ সহ থানার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে ধনী দরিদ্র সকল মানুষের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাড়ী বাড়ী ধান, পাট, বাঁশ ও টাকা পয়সা সংগ্রহ করতে রাত—দিন অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সাথে ছিল এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি প্রতিষ্ঠানটি গড়ার জন্য যারা নিবেদিত ছিলেন তারা অনেকেই বেঁচে নেই কিন্তু তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে যে প্রতিষ্ঠান স্মৃতিময় হয়ে শিক্ষার সৌরভ যুগ যুগ ধরে ছড়িয়ে আসছে তাদের নাম দেশের মানুষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। যারা এই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তারা হচ্ছেন সর্বজনাব মরহুম উবেদ উল্যা মুন্সী, আইন উদ্দিন মৌলভী, সামসু উদ্দিন আহমদ, সূর্য্যালী সরকার, মৌলভী আলী নেওয়াজ, আমির উদ্দিন ভূইয়া (বাবু মিয়া), মিয়াচাঁন ভূইয়া, মিয়াচাঁন দালাল, এলাহী নেওয়াজ, আহসান উল্যাহ ভূইয়া, ইয়াছিন মাষ্টার (ছোট), ইয়াছিন মাষ্টার (বড়), আলী নেওয়াজ ভূইয়া (আলী), শাহ আব্দুল মান্নান মৌলভী, আব্দুল গফুর সরকার, আব্দুল মান্নান (ডেঙ্গু), ছমিরউদ্দিন শেখ, ছায়াবালী বেস্তী, ইসলাম মোল্যা, ছবর আলী মুন্সী, শাহ নেওয়াজ, আশ্রাব আলী ফকির, কাবিল প্রধান, নায়েব আলী প্রধান, বাবু মিয়া, আবুল হোসেন, গোপাল ঠাকুর, নরেন্দ্র চন্দ্র রায়, দেওনত খাঁ, রহিম বক্স সরকার, আলী বক্স, মিলু শেখ, খাঁন মাহমুদ, সাদত আলী ভূঞা, ইয়াকুব আলী মাষ্টার এবং আরও অনেকে। তারা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য রেখে গিয়েছেন এক অনন্য ইতিহাস। অন্ধকার সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করে গিয়েছেন যারা তাদের উদ্দেশ্যে একটি ছড়া প্রনিধানযোগ্য।

সাথে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাই তুমি করে গেলে দান।

মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়ার নেতৃত্বে এলাকার ত্যাগী সমাজকর্মী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ প্রতিষ্ঠানটি গড়ার মত মহতি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন অবিরাম।

পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুল নাম— একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাম। এলাকার জনগণের বহু

আকাংখিত ও মুসলিম চেতনার প্রতীক এই নামটি কারও কারও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্রও ছিল কিন্তু কোন ষড়যন্ত্রই এই বিপ্লবী চেতনাকে স্তিমিত করতে পারেনি। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল উক্ত নামে কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় হতে মঞ্জুরী পাওয়া। এই এলাকায় মুসলিম রেনেঁসার উন্মেষ ঘটেছিল বহুপূর্ব থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে—শাহ ইরানীর মাজার— যা মুসলিম স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন বহন করে। পোড়াদিয়ার অনতিদূরে পশ্চিমে অবস্থিত শাহ ইরানীর মাজার ওখানে শায়িত রয়েছেন আল্লাহ ওলী। প্রকৃত পক্ষে সেখানে অতি প্রাচীন কালে শাহ—ইরানী নামে জনৈক অলি আল্লাহর মাজারকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠে। তাই এ স্থানের নামকরণ হয় শাহ—ইরানী। এটি পাটুলী ইউনিয়নের পশ্চিম অংশে গহীন বনের ভিতর টিলা ও পাহাড়ের পাদদেশে প্রাচীন মুসলিম ঐতিহ্য বহন করছে। হিন্দু—বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকায় ইসলামের আলোক বর্তিকা প্রজ্জলিত করতে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাদের মধ্যে হযরত শাহ—ইরানী অন্যতম প্রধান। মনে হয় সেখান থেকে উদ্যোক্তাগণ মুসলিম ঐতিহ্যের বাহন হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা বিস্তারে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হন।

পোড়াদিয়ার পাশের গ্রাম মাত্র কয়েক'শ গজ দূরে ঐতিহ্যমন্ডিত চন্ডিপাড়া গ্রাম। চন্ডিরাজার বাসস্থানের চিহ্ন পাওয়া যায়। অনেক পুরাতন ইট ও কারুকার্যখচিত অনেক নিদর্শন আজও ছড়িয়ে আছে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্বিকগণ মনে করে তার আগমন আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে। এমনি প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুসলিম ও হিন্দু ঐতিহ্যের ছোঁয়াচের মধ্যে পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। হিন্দু প্রাধান্য এলাকায় তৎকালে মুসলিম নাম সংযোজন করে মঞ্জুরী পাওয়া যে কত কঠিন কাজ ছিল তা ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার। অনেক ঘাত প্রতিঘাত ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া এই অসম্ভব কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন কেবল তার অকুতভয় সাহস ও প্রতিভাবলে। তিনি সব কিছু জয় করতে পিছপা হননি।

তৎকালে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ সহ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। হাই স্কুলের মঞ্জুরী আনার জন্য তিনি ছুটে চলেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমুখে। যেখানে হিন্দু কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কাছে এ নাম নিয়ে আবদার করা খুবই দুঃসাহসের কাজ ছিল। স্কুলের মঞ্জুরীগ্রহণের প্রাক্কালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছেন পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল হামিদ ভূইয়া স্কুলটির প্রতিষ্ঠা লগ্ন ও তার পূর্ব হতে হিন্দু মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তিনি হিন্দু—মুসলিম দাঙ্গাকে রোধ করে হিন্দু—মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হাজার হাজার হিন্দু সম্প্রদায়কে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সনে বৃহৎ দাঙ্গাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মনোহরদী, রায়পুরা, কটিয়াদি থানাসহ ভাউয়াল পরগনার বিভিন্ন থানায় আত্মঘাতী দাঙ্গা বন্ধ করার চেষ্টা করেন এবং এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় তা বন্ধ করতে সক্ষম হন। এই মানবতাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আব্দুল হামিদ ভূইয়া যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন তা—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছেন এবং পরবর্তীতে এ ধরনের কাজের সন্মানার্থে পোড়াদিয়া হাই স্কুলের মঞ্জুরী প্রদান করেন।

রাণী বিলাস মনি হাই স্কুলের সম্মুখে রাজ বাড়ীর প্রধান ফটকের সম্মুখে প্রশস্ত মাঠে আন্ত স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পোড়াদিয়া হাই স্কুল টিম। সেই সময় স্কুলটি যেমন লেখাপড়ায় ছিল শীর্ষস্থানে তেমনি খেলাধূলায়ও ছিল শীর্ষস্থানে। আব্দুল হামিদ ভূইয়া সাহেবের পরিচালনায় জয়দেবপুর রাজবাড়ীর স্কুল মাঠে সপ্তাহব্যাপী ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করে একক বিজয় ছিনিয়ে আনে এবং জকি মেমোরিয়েল শীল্ড লাভ করে বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে সুখ্যাতি অর্জন করে। এই সুনাম ও বিরল ঘটনা ও গৌরবদীপ্ত বিজয় ভাউয়াল রাজার প্রতিনিধিকে দারুনভাবে আকৃষ্ট করে এবং এর পুরুস্কার স্বরূপ স্কুল বাৎসরিক ১২০০/= (বারশত)

টাকা স্থায়ী মঞ্জুরী হিসাবে পেতে থাকে যা আজও অব্যাহত আছে। সে সময় পোড়াদিয়া ফুটবল টিমে ছিলেন নিন্দু, ডেঙ্গু, পণ্ডিত, ইন্দু, জানুকী, তেজেন্দ্র, কাঞ্চন, মলাই আরও অনেকে। তাদের নাম খেলোয়ার হিসাবে সমগ্র অঞ্চলে কিংদন্তীর মত ছড়িয়ে আছে।

স্কুল থেকে অনেক কৃতিছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করা হত এবং সরকার বাহাদুর থেকেও অনেকেই বৃত্তি পেত। ভাউয়ালের পূর্ব অঞ্চলে একমাত্র পোড়াদিয়াতেই মাইনার বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ২য় শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন সুদূর হাতিরদিয়া থেকে।

স্কুলের মাঠটি বিরাট। তারই চারপাশে আম, কাঠাল, আর বটবৃক্ষের শ্যামল ছায়া স্কুলের পরিবেশকে অত্যন্ত মনোরম করে তুলেছিল। ফুটবল খেলার মাঠটা সর্বদাই গরম হয়ে উঠত। আন্তজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা সর্বদা পোড়াদিয়াকে মুখরিত করে তুলত। এসব বিরল দৃশ্য আমাদের বাল্যকালে কিছুটা দেখার ভাগ্য হয়েছিল। বর্ষার মৌসুমে নদী যখন ভরে দুকুল ছাপিয়ে উঠে তখন বর্ষার দৃশ্য উভয় কুল হতে অত্যন্ত সুন্দর প্রতিয়মান হয়। বর্ষার ভরা নদীতে কাঠালের সওদা করার জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান পোড়াদিয়াতে ভাটি অঞ্চলের রঙ বেরঙের পালের নৌকার ভীর জমে। সিলেট, সুনামগঞ্জ, বানিয়াচং ও আরও অনেক ভাটি অঞ্চল হতে অসংখ্য নৌকা রঙীন পাল তুলে ঘাটে ভিড়ে কাঠ নেয়ার জন্যে। মাইলব্যাপী নৌকার সারি অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্য ফুটিয়ে তুলে। মনে হয় হাতছানি দিয়ে ডাকছে নৌকার মাঝিরা। ভাটি অঞ্চলের আম, কাঠালের ব্যবসায়ীদের আগমনে পোড়াদিয়া বাজারটি ছোট শহরের মত মনে হয়। এই সুবাদে মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়ার ভাটি অঞ্চলেও ধান কালেকশন করার জন্য গিয়েছেন। তাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল কি করে স্কুলটিকে স্বর্ণ শিখরে উঠানো যায়। তিনি ভাটি এলাকায় মাসাধিক কাল অবস্থান করে প্রচুর ধান নিয়ে এসে স্কুলের উন্নয়নের কাজ করতেন।

স্কুলে আগত দূর অঞ্চলের ছাত্রদের লজিং ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য এক সঙ্গে ২০/২৫ জন সঙ্গে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে দেখা গেছে সন্ধ্যার পূর্বেই প্রায় সবাইকে লজিং এর ব্যবস্থা করে চলে এসেছেন। কেউ 'না' করতে পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টিই করতে দেননি। ভূইয়া সাহেব নিজ বাড়ীতে ১০/১২ জন ছাত্র এবং ৩/৪ জন শিক্ষক সর্বদাই রাখতেন। তাদের তিনি নিজ হাতে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন।

ভারত বিভক্ত হওয়ার পূর্বে স্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল এবং পাক—স্বাধীনতার পূর্ব মহূর্ত পর্যন্ত গৌরবময় ঐতিহ্য অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতা উত্তর অনেক হিন্দু শিক্ষক বাপ দাদার ভিটে মাটি ছেড়ে ভারতে চলে যান যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে দারুণ শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কিছু দিন এমনি অবস্থা চলতে থাকলে অর্থাৎ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত খারাপ অবস্থা অতীতের সুনাম ক্ষুন্ন করতে থাকলে ভূইয়া সাহেব কলকাতা হতে ভাল শিক্ষক আনার জন্য গেলেন। দীর্ঘদিন নদীয়ায় অবস্থান করে সেখানে থেকে কামিনি বাবুকে পুনরায় পোড়াদিয়া স্কুলে নিয়ে আসলেন এবং তাকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করলেন। তারপর থেকে স্কুলের অবস্থা আবার উন্নতির দিকে চলল। স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ১২ জন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। শিক্ষকের এত সংকট থাকা সত্বেও অনেক জ্ঞানী—গুণী শিক্ষকের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তিনি। স্কুলের সৃষ্টি লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত সুনাম ধন্য প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাদের নাম ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদান করা গেল।

(১) জনব আলী (২) আব্দুল হক (চট্টগ্রাম) (৩) মৌঃ আবু তাহের বি এ বি টি (শিবপুর) (৪) হানিফ মিয়া ভৈরব) (৫) আবু নাসের ওহিদ (বাক্ষণবাড়ীয়া) (৬) কামিনী বাবু (৭) মোজাফফর আহম্মদ এম, এ (জামালপুর) (৮) আনোয়ার হোসেন এম, এ (৯) আব্দুল হক (ঢাকা) (১০) মাহবুবুল হক (ধামড়াই) (১১) হাসান আলী বি, এ বি, টি (লক্ষীপুর) (১২) ইউনুছ আলী ভূইয়া এম, এ (খিদিরপুর) (১৩) সামসুল হক (ভারপ্রাপ্ত) (পোড়াদিয়া) (১৪) মজিবুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত) বি, এ (জামালপুর) (১৫) আওরঙ্গজেব ইয়াকুব এম, এ বি এড (মনোহরদী) (১৬) মোঃ শহীদুল্লাহ ভূইয়া বি এ, বি, এড (মুগা) (১৭) সামসুউদ্দিন আহমদ বি এ, বি এড (১৮) জিন্নত আলী

বি, এ, বি, টি (বেলাব) (১৯) শাহ বদরুউদ্দিন (কুলিয়ার চর) (২০) আব্দুল কাদির এম, এ, বি, এড (জামালপুর) (২১) ফজলুর রহমান রেনু মিঞা (বড় চাপা) (২২) মোসলেহ উদ্দিন আহমদ (বর্তমান, লোহাজুরী)।

১৯৬২—৬৩ অর্থ বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয় সমগ্র দেশে। স্কুলটিকে ডেভাল্যাপমেন্ট স্কীমের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর আশা ছিল দেশের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকাভুক্ত হবে। তিনি ডি, ডি পি, আই ও অন্যান্য পদস্ত কর্মকর্তাদের অফিসে তদবির করেছেন কিন্তু ডেভাল্যাপম্যান্ট স্কীমের অন্তর্ভূক্ত হল বিন্নাবাঈদ হাই স্কুল। রহস্যজনকভাবে স্কুলটি Development scheme থেকে বাদ পড়ে যায়। তিনি অনেক ধৈর্য্য ধরেছেন। ঢাকায় অবস্থানরত পোড়াদিয়ার প্রাক্তন কৃতি ছাত্রদের নিয়ে চেষ্টা শুরু করেন। তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সরাসরি চলে যান এবং আবদার জানান এলাকার বৃহত্তর স্বার্থে এটাকে ডেভাল্যাপম্যান্ট স্কীমের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য। ১৫/১৬ জন সংসদ সদস্যও এর জন্য চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘ ছয় মাস ঢাকায় অবস্থান করে স্কুলটিকে ডেভাল্যাপম্যান্ট—এর তালিকাভুক্ত করে পোড়াদিয়াতে পা ফেল্লেন এবং তিনি যখন লঞ্চ যোগে নদীর ঘাটে এই সুখবর নিয়ে অবতরণ করেন তখন হাজার হাজার ছাত্র, যুবক ও বিপুল জনতা মুহর্মূহ শ্লোগানে আকাশে বাতাস প্রকম্পিত করেছিল। সকলেই তাঁকে সম্বর্ধনা জানান এবং মাল্য ভূষিত করেন। পরবর্তীতে পোড়াদিয়ার মাঠে বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন তৎকালিন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী শেহেবুল্যাহ, উপস্থিত হন সংসদ সদস্য আঃ হামিদ এম, এস, সি, উপস্থিত হন ধনাঢ্য ব্যক্তি রাজিউদ্দিন ভূইয়া। উপস্থিত হন কৃতিছাত্র মরমী কবি জনাব ছাবির আহমদ চৌধুরী। বক্তব্যের সাথে তার স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সভায় রেডিও শিল্পী বেতার উদ্দিন মরমী সঙ্গীতে "আল্লাহু' আল্লাহু" ধ্বনিতে উল্লসিত হয় আপামর জনতা। মরহুম আঃ হামিদ ভূইয়ার বক্তব্য শুনার জন্য হাজার হাজার মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল। ভূইয়া সাহেবের বক্তব্যের মধ্যে সমবেত জনতার করতালিতে সভা মুখরিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল স্কুলটি ভূইয়া সাহেবের প্রাণের চেয়েও প্রিয় তাই মানুষ তাঁকে ভালবাসত এবং তার কথা শুনার এত আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল।

আমার স্মৃতিতে পোড়াদিয়া হাই স্কুল

মোঃ শামছুল হক
থানা শিক্ষা অফিসার

নরসিংদী জেলার বেলাব থানার সাত কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত পোড়াদিয়া হাই স্কুল। এরই পূর্ব পাশ দিয়ে কূল কূল রবে শর্পীল গতিতে প্রবহমান আড়িয়াল খাঁ নদী। এর তীরবর্তী বকুল কুঞ্জের সৌরভ ও দাতই বনের বনযোগে চোখ রাখলে স্থানটিকে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'গ্রাসমিয়ার' বলে মনে হয় বলে প্রায়ই বলতেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বাংলার শিক্ষক জনাব ইউনুছ আলী ভূঞা।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বৎসর চলছিল তখন। সেটা ১৯৩০ সালের কথা। বাংলার মাটি ও আকাশ বাতাস টেরোরিষ্টদের ভয়ে ছিল প্রকম্পিত। রাজধানী কলাকাতা তখন টেরোরিষ্টদের প্রায় দখলে। চারদিকে হত্যা আর ধ্বংসের সংবাদ শুধু। শুধু কলকাতা কেন সারা বাংলাই টেরোরিস্টদের প্রায় করায়ত্ব। ঠিক সে সময় তৎকালীন ঢাকা জেলার মনোহরদী থানার পূর্ব সীমান্তে হিন্দু বেষ্টিত মুসলিম অধ্যুষিত পোড়াদিয়া গ্রামে ভাওয়াল রাজার কাছারির দক্ষিণ পাশে বর্তমান স্কুল মাঠের পূর্বাংশে মুসলিম শিক্ষার ঐতিহ্য হিসেবে অবস্থিত ছিল একটি মাদ্রাসা। এখানটায় ইসলামী শিক্ষা দেয়া হতো। সে সময় পোড়াদিয়ার চার দিকে ১৫/২০ মাইলের মধ্যে আছমিতা, বাজিতপুর ও সাটির পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়া সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এই এলাকাবাসীর ছিল না। তখন পোড়াদিয়া মাদ্রাসার একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষক ও সংগঠক জনাব ইলিয়াছ মাষ্টার সাহেব এলাকার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি যথা মরহুম সোনা উল্লাহ সরকার, আব্দুল হামিদ ভূঞা ইত্যাদি ব্যক্তিগণকে পোড়াদিয়াতে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সংগঠিত করেন। মুসলমানদের সন্তান সন্ততিগণকে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করার জন্য তাঁরা মাদ্রাসাটাকে হাই স্কুলে রূপান্তরিত করার চিন্তা ভাবনা করেন এবং এলাকার জনগণের দুর্দমনীয় ইচ্ছা শক্তির ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আশে পাশের এক বিরাট মুসলিম এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুল।

স্কুল প্রতিষ্ঠা লগ্নে এই স্কুলের নাম ছিল পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুল। এই নামকরণ পাটুলী, ভাবলা, টঙ্গির টেক ও কসবার কিছু সংখ্যক উচ্চ বর্ণের হিন্দু মেনে নিতে পারেনি। মুসলমানরা সে সময় অনগ্রসর সমাজের লোক ছিল। তারা হিন্দু বাবুদের জমি জমা চাষ করতো এবং বাবুদের বাড়িতে গতর খাটতো। তাই মুসলমানের ছেলেরা স্কুলে যাবে এটা তারা ভাল চোখে দেখেনি। সে সময় আশে পাশের উচ্চ বর্ণের হিন্দু বাবুরা তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে কলকাতা সহ দেশের অন্যান্য শহরে রেখে পড়াতেন। মুসলমানের ছেলেরা স্কুলে লেখাপড়া শিখুক এটা তাদের পছন্দ হয়নি। সে সময় দেশে হিন্দুরাই স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতেন। তাই মুসলমান ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য মুসলিম হাই স্কুল নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেছে এটা হিন্দুরা মেনে নিতে পারেনি কোন ভাবেই। তাই স্কুলের বিরুদ্ধে তারা গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করল। স্কুল স্থাপনের পর দেখা দিল এর স্বীকৃতির প্রশ্ন। সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল হাই স্কুল স্বীকৃতি প্রদান কর্তৃপক্ষ। সে যুগে অফিস আদালতে হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। মুসলিম হাই স্কুল নামকরণের কারণে এটি একটি সাম্প্রদায়িক স্কুলে পরিণত হবে— ঢাকা রেঞ্জের স্কুল পরিদর্শক জে লাহিরীর এই রূপ পরিদর্শন মন্তব্য স্কুলের অগ্রযাত্রাকে শ্লথ করে দেয়। স্কুলের বিরুদ্ধে এলাকার হিন্দুদের গোপন ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী জনাব আব্দুল হামিদ ভূঞা কলকাতাতে হাই স্কুলের স্বীকৃতি আদায়ের দেন দরবার শুরু করেন। জনাব ভূঞা সে সময় বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত বঙ্গীয় আইন পরিষদের অবিসংবাদিত নেতা শের—এ—বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেবের স্মরণাপন্ন হন এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী ও শের—এ বাংলার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে তিনি পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুলের স্বীকৃতি আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

শেরে বাংলা একে ফজলুল হক সাহেবের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ঢাকা রেঞ্জের তৎকালীন সাম্প্রদায়িক স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু জে লেহারীকে অন্যত্র বদলী করে একজন মুসলিম স্কুল ইনস্পেক্টর নিয়োগ করে তাঁর পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুলটি স্বীকৃতি লাভ করে। স্বীকৃতির বিষয়টি জনাব

হামিদ ভূঁঞা সাহেবের কাছ হতে শোনা। ১৯৩০ সালে বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও স্বীকৃতি পেতে বিলম্বের কারণে ১৯৩৬ এর দিকে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় এলাকায় শিক্ষার প্রতি গণ জাগরণ সৃষ্টি হয়। ফলে হিন্দুরাও এগিয়ে আসতে থাকে। হিন্দুদের ছেলে মেয়েরাও মুসলিম ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি বিদ্যালয়ে আসতে থাকে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হলেও বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা মুসলিম ছাত্র সংখ্যার প্রায় সমান সমান হয়ে যায়। ফলে শুরু হয় উন্নতির অগ্রযাত্রা। আর কস্তুরীর সৌরভের ন্যায় বিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কি খেলাধুলা, কি লেখাপড়া এবং কি প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদির সব দিক দিয়ে যখন বিদ্যালয়ের সুনাম বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে তখন বহু দূর দূরান্ত হতে জ্ঞান সুধা আহরণের জন্য ছাত্রদের আগমন হতে থাকে, ফলে আশে পাশের প্রায় সকল বাড়িতেই এমনকি দুই বাড়ি মিলে ছাত্রদের জায়গীরের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহের কারণে ১৯৩৯ সনে এই এলাকার চন্ডিপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সে সময় এখানে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হতো।

খেলাধুলায়ও পোড়াদিয়া স্কুলের অনেক এলাকাতেই সুখ্যাতি ছিল। স্কুলের একটি শক্তিশালী ফুটবল টিম ছিল। এই টিমটি ছিল অজেয় অপ্রতিরোধ্য। এখনও এই টিমের কয়েকজন জাদরেল খেলোয়ার জীবিত আছেন। তাদের মধ্যে আঃ কাদের ভূঞা (নিন্দু), আলী নেওয়াজ ভূঞা (ডেঙ্গু) এবং গিয়াস উদ্দিন ভূঞা (মলাই)। সে সময় ভাওয়াল ষ্টেটের অর্ন্তভূক্ত হাই স্কুলগুলোর মধ্যে আন্তস্কুল ফুটবল খেলায় জয়দেবপুর রাজবাড়ীর রাণী বিলাসমনী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় পোড়াদিয়া স্কুল টিম অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এরই ফলশ্রুতিতে ভাওয়াল ষ্টেট কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে পোড়াদিয়া হাই স্কুলের জন্য প্রতিমাসে ১০০/—(এক শত) টাকা হিসেবে মঞ্জুরী প্রদান করেন। এতে স্কুলের সুনাম আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় পোড়াদিয়া হাই স্কুলের স্বর্ণযুগ চলছিল।

পোড়াদিয়া হাই স্কুল এ ভাবেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এরই মাঝে এল ১৯৪৭ সাল। ভারত পাকিস্তান আলাদা হওয়ায় হিন্দুরা দলে দলে দেশ পরিত্যাগ করতে শুরু করল। পোড়াদিয়া স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন হিন্দু। হিন্দুদের দেশ ত্যাগের ফলে স্কুলের ভাল শিক্ষকদের দারুন অভাব দেখা দিল। ফলে বিদ্যালয়ের ফলাফল খারাপ হতে লাগল। ফলশ্রুতিতে স্কুলটির ছাত্র সংখ্যা কমে যেতে থাকে। দক্ষ শিক্ষকের অভাবে ১৯৫০, '৫১ ও '৫২ সনে পর পর তিন বৎসর এই স্কুল থেকে কোন ছাত্রই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেনি। ফলে ছাত্র সংখ্যা আশংকাজনক রকম হ্রাস পায়। ১৯৫৩ সনে ছাত্র সংখ্যা ৫০—৬০ জনে নেমে আসে। স্কুলের আর্থিক দৈন্যতার কারণে শিক্ষকগণও অন্য স্কুলে চলে যেতে থাকেন। সে সময় দুর্যোগের মুহুর্তে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব ইউনুছ সাহেব অকুল সাগরে একাকী হাল ধরে স্কুলটিকে বাঁচানোর জন্য স্কুল মাঠে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করেন। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট আলেম ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বড় চাপা গ্রামের জনাব শাহ আঃ মান্নান। এ জাগরণী সভার পর আবার স্কুলের অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদিগকে আবার স্কুলে ফিরিয়ে আনেন। সে বছর ৫ জন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং তার মধ্য থেকে ৪ জন উত্তীর্ণ হওয়ায় স্কুলের আবার সুদিন ফিরে আসতে থাকে। সে বছর অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। স্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল ১৯৫৪, '৫৫ ও '৫৬ সালেও ভাল হয়। আমরা ১৯৫৭তে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং সেবারও বিদ্যালয়ের গড় ফলাফল ভাল হয়। ১৯৬১—৬২ সনে হাই স্কুলের উন্নয়নকে কেন্দ্র করে পোড়াদিয়া ও বিন্নাবাইদের মধ্যে নানা রকম দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা হাকিম জনাব হেদায়েতুল হক সাহেবের মধ্যস্থতায় পোড়াদিয়া ও বিন্নাবাইদ একই সময়ে বিদ্যালয় উন্নয়ন তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৬৩ সালের আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখে জনাব ছাবির আহাম্মদ চৌধুরী সাহেব জনাব আঃ হামিদ ভূঞা সাহেব সহ এলাকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সে সময় শ্রদ্ধেয় স্যার জনাব ইউনুছ আলী ভূঞা সাহেব নরসিংদী কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করায় আমি সাময়িকভাবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করি। এরপর থেকে স্কুলটির উন্নতি ঘটতে থাকে এবং এই স্কুলটি মনোহরদী বেলাব থানার মধ্যে একটি সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়।

অনন্য ব্যক্তিত্ব মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া

মোঃ নূরুল আমিন
অফিসার, জনতা ব্যাংক
নরসিংদী

ভূমিকাঃ "A man is better known after his death" একজন মানুষের মৃত্যুর পরই যথার্থভাবে প্রমাণিত হয় তিনি কেমন ছিলেন। জীবদ্দশায়ের কর্ম, আচরণ, চিন্তা, বক্তব্য, প্রজ্ঞা ইত্যাদি একজন মানুষকে যে সমাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে মৃত্যুর পরে তা সমাজের মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে, স্থায়ীভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির বিকাশ তার কর্মে, চিন্তায় এবং স্বচ্ছ মননশীলতার বহিঃপ্রকাশে ও চর্চায়। মৃত্যুর অনেকদিন পরেও যখন সমাজ মানসে একজন ব্যক্তির সুকর্মের দিকগুলো শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় হয়ে থাকে তখনই বুঝা যায় যে তিনি জীবৎকালে এমন কিছু কর্ম করে গেছেন যা মৃত্যুঞ্জয়ী। তাই বলা হয়ে থাকে দেহ নশ্বর —কর্ম অবিনশ্বর। মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়ার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে তাই বলতে হয় "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাই তুমি করে গেলে দান।" কৈশোর থেকে অদ্যাবদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যত সংখ্যক শিক্ষক, সমাজকর্মী, রাজনীতিকের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তন্মধ্যে মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়ার ব্যক্তিত্ব আমার কাছে অনন্য সাধারণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে ধনাঢ্য, সুস্বাস্থ্যবান, সংস্কৃতিপ্রিয়, গায়ক, বাদক, সাহসী রাজনীতিক, শিক্ষানুরাগী, সমাজ কর্মী, অতিথি পরায়ন, ধার্মিক ও সংবেদনশীল মানব প্রেমিক।

, তিনি ছিলেন নিরহঙ্কারী, প্রচন্ড বিবেকবান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী, অসীম ধৈর্য্যশীল। এতগুলো সুকুমারবৃত্তির অধিকারী মানুষটির সুদীর্ঘ জীবন ছিল নানা বৈচিত্রে ভরপুর, বর্ণাঢ্য কর্মে দেদীপ্যমান। তাই তিনি বৃহত্তর গণমানুষের হৃদয়ে রূপকথার রাজকুমার বা কিংবদন্তীর প্রাণপুরুষ হিসেবে চির জাগরুক থাকবেন।

বংশ পরিচয় ঃ পোড়াদিয়া বাজারের উত্তর পাশের প্রাচীন ভূইয়া বংশোদ্ভুত জনাব দাগুন ভূইয়া পার্শ্ববর্তী মৃগা গ্রামে প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে বসতি স্থাপন করেন এবং তথায় ৬০/৭০ বিঘা উর্বর কৃষি জমির মালিক হন। জনাব দাগুন ভূইয়া অত্যন্ত সুঠামদেহী, দীর্ঘাঙ্গী, বলবান, সাহসী ও পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া। জন্ম ১৩০৪ বঙ্গাব্দে পক্ষান্তরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। সে যুগেই তিনি শৈশবে এবং কৈশোরে কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। তিনি বাংলা পড়তে ও লিখতে পারতেন। ইংরেজী ও উর্দু অন্যরা বললে তিনি বুঝতে পারতেন।

যৌবন ঃ মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া একসারা দীর্ঘ দেহের অধিকারী ছিলেন। প্রায় ৬ (ছয়) ফুট দীর্ঘ, গৌর বর্ণ, সুউচ্চ নাসিকা, একটু লম্বাটে চিবুক, প্রশস্ত কপাল, প্রসারিত চোখ, যোগল ভ্রু, লম্বাটে কিন্তু দৃঢ় গ্রীবা, মেদহীন মাঝারী—পাতলা স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। শরীর গঠনের দিক থেকে তিনি সিংহ রাশির জাতক ছিলেন বলে মনে হয়। কণ্ঠস্বর ছিল তীক্ষ্ণ তবে ভারী ও আমেজবহনকারী। হাঁটতেন পাতলা অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে। যৌবনে তিনি অত্যন্ত শক্তিধর পুরুষ ছিলেন বলে জানা যায়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং পাকিস্তান আন্দোলনের পুরুধা নেতৃবর্গের সাথে তাঁর উঠাবসা ছিল। যৌবনে তিনি নাটক করতেন, গান গাইতেন, বাদ্যযন্ত্র যেমন হারমোনিয়াম, তবল, ডুগী ইত্যাদি ভাল বাজাতে পারতেন। নাটক ও খেলা ধুলার পৃষ্ঠপোষ্টকতা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্ম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন।

সবচেয়ে নামধাম তিনি করেছিলেন ঘোড়া দৌড়িয়ে। ভৈরবের ধনাঢ্য কামাল সরকারকে তিনি ঘোড়ার রেসে হারিয়ে দিয়েছিলেন এবং ১০ মন বাতাসা (মিঠাই) ছিটিয়ে দিয়েছিলেন ভৈবর বাজারে উল্লসিত ঘোড়দৌড় দর্শকদেরকে। দু'টো তেজী ঘোড়া তিনি পোষতেন এবং দৌড়াতেন। ঘোড়ায় চড়েই তিনি এদিক—ওদিক কার্জকর্মে বেড় হতেন। ঘোড়াগুলো এতই বলবান ও স্বাস্থ্যবান ছিল যে সাধারণ মানুষকে এতে মই বেয়ে উঠতে হতো। আর ভূইয়া সাহেব এক লম্ফে চড়ে বসতে পারতেন। বাড়ীর পূর্ব পাশে লিচু গাছে বাঁধা থাকতো ঘোড়া দু'টো। মাদ্রাসা আকারে পোড়াদিয়া হাই স্কুলের গোড়াপত্তন হয় ভূইয়া সাহেবের যৌবন কালেই। তাছাড়া একছইল্যা ও ফুটবল খেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি তখন। তৎকালীন ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর,

কুমিল্লা জেলার নামীধামী একছইল্যা ও ফুটবল খেলোয়াড়গণ তাঁর বাড়ি সংলগ্ন মাঠে এবং পোড়াদিয়া হাই স্কুল মাঠে বড় বড় খেলায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁরই নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায়।

প্রৌঢ়ত্ব ঃ বৃটিশ শাসনের শেষ ভাগে যখন অত্র অঞ্চল হিন্দু অধ্যুষিত ছিল, শিক্ষাদীক্ষায়, ব্যবসা—বাণিজ্যে চাকুরীতে, ঐতিহ্য এবং প্রতাপে হিন্দুরাই প্রাধান্য বিস্তার করে রাখতো তখন মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া বীরদর্পে পোড়াদিয়া মুছলিম হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান ১৯৩০ ইং সনে এলাকার গণ্য—মান্যসহ সর্ব সাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতায়। তাঁর চূড়ান্ত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য কোলকাতা থেকে স্কুলটি বরাদ্দ করিয়ে আনেন তিনি এবং সেখান থেকে এনেছেন বহু উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকগণকেও। উদ্দেশ্য পশ্চাৎপদ এলাকায় অজ্ঞানতার, অশিক্ষার তিমিরান্ধকার থেকে গণমানুষকে শিক্ষার আলোতে প্রবেশ করানো। উক্ত স্কুল থেকে বহু ছাত্র শিক্ষা—দীক্ষা লাভ করে নিজের পারিবারিক, সামজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরবর্তীতে অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন। অত্রাঞ্চলে শিক্ষার প্রথম আলোক বর্তিকা বহনকারী মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া তাই শিক্ষানুরাগী হিসেবে চির অম্লান। ১৯৬২ ইং সনে তাঁরই একক নেতৃত্বে স্কুলটি ডেভেলপমেন্ট স্কীমের অন্তভুক্ত হয় এবং তিনি মৃত্যুর দেড় বৎসর পূর্ব (১৯৭২ ইং) পর্যন্ত উক্ত স্কুলের ফাউন্ডার সেক্রেটারী পদে আসীন ছিলেন। রেডিও শিল্পী বেদারউদ্দিন ও অন্যান্যদের সমন্বয়ে ১৯৬২ইং সনে উক্ত স্কুল মাঠে এক বিরাট ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তিনিই আয়োজন করেন। বেশ কয়েক বৎসর তিনি পাটুলী ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট পদে সমাসিন ছিলেন।

রাজনীতি ঃ প্রাক—পার্টিশন যুগে তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উপমহাদেশীয় প্রথম শ্রেণীর নেতৃবর্গ যেমন হোসেন শহীদ সোহরোওয়ার্দী, এ, কে, ফজলুল হক, খাজা নাজিমউদ্দিন, আবুল হাসেম, মাওলানা ভাসানী প্রমুখের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে যে খাজা নাজিমউদ্দিনের সাথে এক টেবিলে বসে তিনি মোরগীর মাংস খেয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়ে ছিলেন। ১৯৫৪ ইং সনে এ, কে ফজলুল হক সাহেবের টেবিল চাপড়িয়ে মরহুম শহীদুল্লাহ ভূইয়ার জন্য যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নমিনেশন বাগিয়ে এনেছিলেন। নওয়াব সলিমুল্যার বাসভবনে মখমলের দামী কার্পেট পারিয়ে তিনিই নির্ভয়ে ঢুকেছেন দরবার মহলে। সবার কাছে তিনি একই জিনিষ চেয়েছেন। আর তা হলো পোড়াদিয়া মুসলিম হাই স্কুলের উন্নতি। সেই নির্ভিক নেতা আর কি জন্ম নেবে পোড়াদিয়ার লাল মাটিতে?

খেলাধুলা ঃ পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় আজীবন কাল পেতে থাকবে ভাওয়াল রাজার অনুদান ১২০০/— টাকা পুরুস্কার। ফুটবল খেলার যে চৌকশ টিম তিনি গড়েছিলেন নিন্দু, পন্ডিত, ডেঙ্গু, ইন্দু প্রমুখ তৎকালীন ছাত্রদেরকে দিয়ে তারাই জিতে আনলো উক্ত পুরস্কার ভাওয়াল রাজবাড়ীর মাঠে অনুষ্ঠিত শ্বাসরুদ্ধকর ফুটবল ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে। তারপরেও বহুবার ফুটবল ও একছইল্যা আন্তজেলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে পোড়াদিয়া হাইস্কুল মাঠে—ভূইয়া সাহেবের নেতৃত্বে এবং লাখো মানুষ আনন্দ পেয়েছে সেসব খেলাধুলা দেখে। খেলাধুলার সেরকম সার্থক পৃষ্ঠপোষকতার আজ বড়ই অভাব।

সংস্কৃতি ঃ প্রফেসর ইউনুস সাহেব যখন পোড়াদিয়া হাই স্কুলের শিক্ষক তারও পূর্ব থেকেই ভূইয়া সাহেব হিন্দু অভিজাতদেরকে এবং স্থানীয় সংস্কৃতিসেবীদের নিয়ে বহু নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। গান বাজনার ফাংশন করেছেন বহু। তিনি নিজে গেয়েছেন গান বিশেষ করে কাওয়ালী। তাঁর গাওয়া গানের চরণ প্রফেসর ইউনুস সাহেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনেছি বহুবার। সর্বশেষ তিনি স্বয়ং হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়েছেন ১৯৭২ সনে তাঁর ৭৩ বৎসর বয়সে পোড়াদিয়া হাই স্কুল অফিস প্রাঙ্গনে বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে। দর্শক শ্রোতারা পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেয় তাঁকে—তিনি মিষ্টি খাওয়ান আমাদেরকে একশত টাকার। স্বতস্ফুর্ত সংস্কৃতি সেবীর ভূমিকায় তাঁর মতো অবদান রাখার বিকল্প ব্যক্তি আজো আমাদের সমাজে নেই।

পোষাক পরিচ্ছদ ঃ মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া সৌখিন পোষাক পরিচ্ছদ পরতেন যেমনঃ প্লেকার্ড রহিতপুরী লুঙ্গী তা—ও নিজে বাবুরহাট থেকে কিনে নিতেন। গিনি গোল্ড হাফ হাতা গেঞ্জি (কুঁড়া রং), ৮০/২০ জাপানী (প্লইন) টেট্রন পাঞ্জাবী এবং ৬৫/৩৫ জাপানী টেট্রন পাজামা। জিন্নাহ ক্যাপ মাথায় দিলে তাঁকে অনেকটা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো দেখাতো (কারণ চেহারা ও শরীরের গঠনের সাথে মিল ছিল)। সাদা টেট্রনের/সুতীর টুপীও তিনি পড়তেন। পায়ে সাদা রং এর চামড়ার নাগরা জুতো। কাপড়জামা সর্বদাই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ও ইস্ত্রি করানো থাকতো। পাঞ্জাবীর দু'পকেটে দু'টো গোল আয়না (ছোট) এবং একটি ছোট চিরুনী থাকতো

যা বের করে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার নির্জন জায়গায় থেমে মাঝে মধ্যে নিজেকে দেখে নিতেন, মাথায় নাতি—দীর্ঘ চুল সামান্য পিছন দিকে কাঁত করে আঁচড়াতেন, এবং ছেঁটে রাখা দাড়ি ও আঁচড়াতেন। তাঁর গোফ সর্বদাই সেইভ করা থাকতো। পরিবারের ছেলেমেয়ে, নাতি—নাতিনীদেরকে ভাল, দামী এবং রুচিসম্মত কাপড় জামা পারতে দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর শিয়রের নিচে রাখা ইস্ত্রি করা গিনিগোল্ড গেঞ্জী, পাজামা, পাঞ্জাবী ও লুঙ্গী পাওয়া গিয়েছিল এক সেট। কারুকার্যখচিত বিছানার চাদর, টেবিলের কভার এগুলো তিনি কোলকাতা থেকে বহু আগেই কিনে রেখেছিলেন যেগুলো এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। বাসনকোশন, চামচ, চায়ের কাপ, কেটলী, পিরিজ, বাটি ইত্যাদি সবই ছিল চায়নীজ—পাতলা, মসৃণ, নক্সাকাটা অথচ মজবুত হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলেও ভাঙ্গতোনা। এগুলো তিনি নিজে ব্যবহার করতেন, পরিবারের সদস্যরা ব্যবহার করতো এবং মেহমানের আপ্যায়নে ব্যবহার করতেন।

অতিথি আপ্যায়ন ঃ মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়ার জীবন স্মরণীয় হয়ে থাকতো—অন্য কোন কর্ম না থাকলেও কেবল মাত্র তাঁর সহৃদয় ও অন্তগূঢ় অতিথি পরায়ণতা দ্বারাই। যারা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁর বাড়িতে গিয়েছেন অথবা আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন তাদের স্মৃতিতে নিমিষেই ঝলকে উঠবে ভূইয়া সাহেবের সেই দেবমূর্তি; গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর কর্ণকোহরে বেজে উঠবে অকস্মাৎ। দিব্য চোখে দেখতে পাবেন যে, তিনি নিজ হাতে বিছানা পেতে দিচ্ছেন অথবা চেয়ার পেতে বসতে অনুরোধ জানাচ্ছেন, বাড়ির অন্দরে খানা—দানার আয়োজনের সমারোহ ঘটানোর জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। সাথে সাথে বাড়ির একজন সদস্য নিয়ে আসছে হাত পা ধুয়ার পানি, তোয়ালে , সাবান ইত্যাদি তা সময় তখন যা—ই হোক। হোক না রাত বারটা কিংবা একটা। লোকসংখ্যা যত বেশী হয় ততই ভালো। ভূইয়া সাহেব নিজ হাতে রেঁধে খাওয়াতে পারবেন ভেবে উৎফুল্ল হতেন। নিজ হাতে রাঁধতেও পারতেন চমৎকার। তাঁর এই আতিথেয়তার পেছনে কোনই উদ্দেশ্য থাকতো না। যেনো তিনি অর্পিত দায়িত্ব পালন করছেন। সুস্বাদু বহু আইটেমের খাবার অতিথিদের খাওয়ানোর পর বিদায় বেলায় তাঁর শিশুসুলভ সারল্যে ভরা সবিনয় কুর্ণিশ, "বুঝলামনা—কিনা—ভাল খাওয়াতে পারলাম কই। এগুলো কি ভাল খাবার না—কি? একি না—কিনা—আমরা কত ভাল ভাল খেয়েছি" ইত্যাদি ইত্যাদি। পোড়াদিয়া বাজারে সামসু বাপের চা স্টলেই তিনি চা পান করতেন বেশী। সকাল—বিকাল এবং রাত্রি বেলা চা খেতেন বেশ কয়েক কাপ। চা স্টলের সবাইকে তিনি চা খাওয়াতেন। কে পর কে আপন—কে চেনা কে অচেনা, কে ছোট কে বড় ভ্রুক্ষেপ না করে। নিজে চায়ে চিনি খেতেন বেশী। চায়ের কাপের তলানীতে সুখ টান দিতেন।

অত্রাঞ্চলে কোথাও যদি খেতে হয়, বেড়াতে হয়, রাত্রি যাপন করতে হয়, সাহায্য সহযোগিতা পেতে হয় তা'হলে প্রথমই ভূইয়া সাহেবের বাড়ির কথা বিবেচনা করত দূরের কিংবা কাছের মানুষ। তিনি নিজেও খেতেন প্রচুর ভাল, সুস্বাদু ও পরিচ্ছন্ন খাবার যেমন টাটকা শাকশব্জি, দুধ, মিষ্টি, দৈ, মাছ, মাংস ইত্যাদি। দৈ—এর মধ্যে মরণ চাঁদের দৈ, মাছের মধ্যে রুই এবং মাংসের মধ্যে খাসির মাংস তিনি বেশী পছন্দ করতেন। সরু চালের ভাত তার প্রিয় ছিল। বাজারের সেরা মাছ তিনিই কিনবেন এটাই ছিল তখন সাধারণ ভাবে বিশ্বাস্য। দু'হাতে খরচ করেছেন তিনি খাওয়া—দাওয়া, পোষাক—পরিচ্ছদ, অতিথি আপ্যায়ন ও পোড়াদিয়া হাই স্কুলের উন্নয়নের স্বার্থে। কথিত আছে যৌবনে তিনি একাই এক খাসির মাংস খেতে পারতেন। তিনি ছিলেন চেইন স্মোকার—কিন্তু খুব কম লোককেই তিনি সিগারেট প্রদান করতেন।

শিক্ষানুরাগ ঃ সুদূর কোলকাতা এবং দেশের আনাচেকানাচে থেকে খুঁজে এনে যথার্থ শিক্ষিত এবং পন্ডিতগণকে তিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত পোড়াদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। মানুষের দ্বারে দ্বারে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন ছাত্র, শিক্ষক লজিং দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বিখ্যাত প্রধান শিক্ষকগণকে দায়িত্ব দিয়েছেন স্কুলের পড়াশুনার মানোন্নয়নের জন্য। যার দরুন এককালে বহু দূর থেকেও অসংখ্য ছাত্র—ছাত্রী পড়াশোনার জন্য উক্ত বিদ্যালয়ে আসতো। তাঁর নিজ বাড়িতে ৩/৪ জন শিক্ষক ও ৬/৭ জন ছাত্র সবসময় থাকতেন, খেতেন ও পড়াশুনা করতেন। নারী শিক্ষার প্রতিও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। নিজের বাড়ি থেকে ঘর ভেঙ্গে এনে স্কুলে গড়েছেন তিনি। জমি বিক্রী করে ছাত্রদের ফরম ফিল আপের টাকা পরিশোধ করার মতো ঘটনা রয়েছে। স্কুলের উন্নয়নের কাজে ৩/৪ মাস বাড়ি ছেড়ে কোলকাতা ও ঢাকায় অবস্থান করেছেন। পরিবারের খোঁজ খবর সঠিক ভাবে নিতে পারেননি। শুধু স্কুলের কাজে আত্মমগ্ন থাকার জন্য ছাত্র—ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি পর্যবেক্ষণের জন্য শিক্ষক পাঠিয়েছেন রাত্রি বেলা, নিজেও তদারকী করেছেন ভাল ছাত্রদের

পড়াশুনার। গরীব, মেধাবী ও চরিত্রবান ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করেছেন, বৃত্তি দিয়েছেন, ফ্রিষ্টুডেন্ডশীপ দিয়েছেন। মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে একছত্র অধিকার খাটিয়ে চাঁদা হিসেবে ধান, চাল, বাদাম, কাঁঠাল, বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন যুগের পর যুগ। এমন স্বত্বত্যাগী শিক্ষানুরাগী যুগে যুগে জন্মালে আমাদের সমাজ শিক্ষাদীক্ষায় আরো অগ্রসর হতো নিঃসন্দেহে। অসংখ্য গরীব ঘরের—সন্তান এবং মেয়েরা উক্ত বিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শিখে নিজেদের জীবনের দীশা যেমনি খুঁজে পেয়েছেন তেমনি দেশের মুখ করেছেন উজ্জ্বল। শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক পোড়াদিয়া উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়ার এক সাহসী ও বলিষ্ঠ প্রত্যয় এবং মানব প্রেমের পরম পরাকাষ্টা।

নিরহঙ্কার ঃ মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়া ছিলেন নিরহঙ্কারী ও মিতভাষী। মুচীর বাড়ীতে দাওয়াত খেয়েছেন তিনি। ধনী, গরীব, বংশপরিচয় নির্বিচারে তিনি মানবিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। কাউকে ঘৃণা করা দূরে থাক—সবাইকে যেন তিনি নিতান্ত আপনজন, আত্মীয় ভাবতেন। কাউকে কটু কথা বলা, তিরস্কার বা ভৎর্সনা করা, নিন্দাবাদ বা গিবত করা, সমালোচনা করা ছিল তার সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ। সর্বংসহা নীলকণ্ঠের মতো আপন মনে সমাজের জন্য কাজ করে গেছেন তিনি সারাটি জীবন। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। কেউ তাঁর শত্রু আছে সেটা তিনি বিশ্বাসই করতেন না। ছোটদেরকে তিনি অত্যধিক স্নেহ করতেন। গরীবদের খোঁজখবর নেয়া, আর্থিক ও বৈষয়িক সহায়তা করা ছিল তাঁর মজ্জাগত অভ্যাস। মৃত্যুর পর এই মহতীর কবর পাশে অনেককেই রোদন করতে দেখা গেছে যাদের অনেকেই আমাদের অপরিচিত। কাকে কখন তিনি উপকার করেছেন তা তার নিজেরই মনে থাকতো না; কাউকে তিনি সেসব কথা কোনদিন বলতেনও না। শিশুর সারল্য তাঁর সামগ্রিক আচার ব্যবহার ও কথোপকথনে আবিষ্ট হয়ে থাকতো। কারো সাথে তিনি দুর্ব্যবহার বা উৎপীড়ন করেছেন এমন উদাহরণ একটিও নেই। বাড়ির চাকর—বাকরকে নিয়ে একসাথে বসে খেতেন; তাদেরকে নিজেই খাওয়াতেন। দিনমজুরগণকে মাংস, দুধ কলা খাইয়ে দিতেন প্রতিদিন। তাই তারা মজুরীর কথা ভুলে যেত অথচ তিনি তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করতেন গতানুগতিক রেইটেরও অনেক বেশী।

জীবজন্তুকে তিনি ভালবাসতেন—অপার স্নেহমমতা করতেন এবং সেগুলোর সাথে তার বেশ সখ্যতা ও বাৎসল্য সম্পর্ক বিরাজ করতো সবার অলক্ষ্যে। পালের বড় বড় গরুগুলোর জন্য তিনি নারায়নগঞ্জ ও ভৈরব থেকে ভূষি ও খৈলের বস্তা নিয়ে আসতেন নৌকা বোঝাই করে। গরুগুলোও ছিল তাঁর অত্যন্ত ভক্ত—শো বললে শুইতো—উঠ্ বললে উঠ্তো। তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে গরু, পোষা কুকুর ও বেড়াল নিজ নিজ ভাষায় তাঁকে স্বাগত জানাতো। নিত্য খুজ খবর নিতেন তিনি তাদের। গাছ পরিচর্যায় তাঁর সখ ছিল। নিজ হাতে বাগানও মাঠ পরিষ্কার করতেন। স্কুল মাঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর।

ধর্মকর্ম ঃ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন। ফজরের নামাজের পর পবিত্র কোরান তেলাওয়াৎ করতেন সব সময়। সাদা কিস্তি টুপী মাথায় থাকতো, পরনে থাকতো সাদা পাঞ্জাবী। পোড়াদিয়া জামে মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করতেন—ঈদের নামাজ পড়তেন পোড়াদিয়া ঈদগাহ মাঠে। গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' বইটি সর্বদা তার শিয়রের পাশে থাকতো। অবসর সময়ে প্রায় তিনি বইটি পড়তেন বিছানায় বসে বসে অথবা শুয়ে শুয়ে। তাঁর মৃত্যুর দিনও শিয়রের পাশে রক্ষিত ছিল "বিশ্বনবী"।

এমন নিরহঙ্কারী, সরলপ্রকৃতির, উদার মনোভাব সম্পন্ন, স্বতঃত্যাগী, মানবহিতৈষী সমাজে যুগে যুগে জন্মায় না। এঁরা ক্ষণজন্মা। তাঁরা সাধারণ্যের উর্ধ্বে—মহাপুরুষ। সারাজীবন চেইন স্মোকার হয়েও নিঃরুগ ছিলেন তিনি। ১৯৭৩ ইং সনে ফজরের নামাজ শেষে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরেন এবং বেলা ১১ টার সময় ৭৬ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। "Cowards die many times before their death; but a hero dies once." মরহুম আবদুল হামিদ ভূঁইয়াও চলে গেছেন সুখ—দুঃখের সীমা পেরিয়ে, পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র ও ভূমন্ডলের দিগন্ত পেরিয়ে অসীম নীলিমার সাথে লীন হয়ে। আকাশের মতো উদার তাঁর আত্মা আকাশেই নিয়েছে ঠাঁই। আমরা ক'জন মর্তের জ্বালাময় অবস্থানে থেকে আকণ্ঠ স্মৃতি রোমন্থন করছি তাঁর এবং তাঁরই যিনি আমদেরকে দিয়েছেন প্রচুর—পেয়েছেন খুব কমই। মহান স্রষ্টা যেন তাঁর পাওনা পরিশোধ করেন এ কামনা আমাদের সবার। কবি মিল্টনের ভাষায় "It is better to serve in heaven than to reign in hell."

সন্ত্রাসের জন্ম ও উৎখাতের উপায়

মোঃ সাইদুর রহমান
এডভোকেট, নরসিংদী জজকোর্ট।

ছোট বেলার কথা। তখন বৃটিশ আমল। বৃটিশের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলন তুঙ্গে। এক দল স্বাধীনতা প্রেমিক সহিংস আন্দোলনে মেতে উঠে তখন। তাদের মতে গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলন ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়াতে যথেষ্ট নয়। তাই তারা 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন' এর নামে ইংরেজদের মনে ভীতির সৃষ্টির লক্ষ্যে মাঠে নেমে পড়ে। তারা কিছু কিছু ইংরেজ—রাজকর্মচারীকে হত্যা করে। এভাবে আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ তখন সন্ত্রাসী আন্দোলন চালাতে থাকে। তাই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে এই রাজনীতিবিদদের ত্যাগ তিতিক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় থেকে আমরা 'সন্ত্রাসবাদ' এর কথা শুনতে থাকি। সন্ত্রাসবাদীরা ফান্ড (Fund) সংগ্রহ করত বৃটিশ দোসর ও ধনী জমিদারদের কাছ থেকে হিতে বেহিতে ত্রাস সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য একটিই — 'ইংরেজ খেদাও, দেশ স্বাধীন কর'। তখন থেকে আমি সন্ত্রাসবাদ কথাটা শুনে আসছি। তারপর ইংরেজ গেল, ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ রইল। ক্ষমতার লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে রাজনীতিবিদগণ দলগতভাবে সন্তাসবাদী সৃষ্টি করছে এবং তাদেরকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। পূর্বে রাজনীতিবিদগণ সন্ত্রাসীদের সার্বক্ষনিক লালন—পালন করতে পারতো। কিন্তু এখন বিশেষত বাংলাদেশের রাজনীতিবিদগণ তা আর পারে না। কারণ আজকাল বাংলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে অভাব। লেখাপড়া শিক্ষা করেও বহু বহু মানুষ বেকার। অভাবের তাড়নায় চরিত্র ঠিক রাখতে পারছেনা, আদর্শ ঠিক রাখতে পারছেনা। ব্যয় বহুল শিক্ষা লাভ করে ফায়দা হচ্ছে খুব কম। নৈতিকতা ও শান্তি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এখনতো কলেজ ইউনিভারসিটির শিক্ষকগণও সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে খেলছে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য। নিম্নশ্রেণীর সরকারী বেসরকারী কর্মচারীগণ নিজেদের সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবি মহল যখন সন্ত্রাসবাদীদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে অপারগ তখন সন্ত্রাসীগণ তাদের হত্যা, লুটপাট, গাড়ী ভাংচুর, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, ধর্ষণ, অপমান, জ্বালাও পোড়াও, শিক্ষাঙ্গনে সশস্ত্র সংঘর্ষ ইত্যাদি জঘন্য কাজ চালাচ্ছে। তাদের সংগে আলোচনায় বুঝা যায় যে, তারা একদম চেতনাহীন নয়, কিন্তু হতাশাগ্রস্ত। একদম হৃদয়হীন নয়, কিন্তু অভাবগ্রস্থ। অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায়, একশ্রেণীর লোক যারা সমাজে মর্যাদা সম্পন্ন প্রভাবশালী, তারা সংঘবদ্ধভাবে সন্ত্রাসীদের পিছনে বহাল তরিয়তেই রয়েছে। এরা বেশ মজবুত। তাই দুর্নীতির মতো সন্ত্রাস গ্রামে—গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে। এখন সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য আর একটি নয়—বহু। সন্ত্রাস এখন তাদের লাভজনক পেশায় পরিনত হতে চলছে প্রায়। এটাকে নির্মূল করা বড়ই শক্ত কাজ। এজন্য দরকার পারস্পরিক সহযোগিতার। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, সন্ত্রাসের উদ্ভাবক দেশের রাজনীতিবিদগণ। রাজনৈতিক নেতাগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সন্ত্রাসদল গঠন করে থাকেন। তাই সবার আগে দলমত নির্বিশেষ সকল রাজনীতিবিদগণকে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য এগিয়ে আসতে হবে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে। তাদের সাথে পূর্ণ ও আন্তরিক সহযোগিতা দিতে হবে শিক্ষক, অভিভাবক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে। তাছাড়া যে অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবিগণ থেকে যায় তাদেরও উদাসীন থাকলে চলবে না। তাদের জ্ঞান—অভিজ্ঞতাও সন্ত্রাস নির্মূলের কাজে লাগাতে হবে। তবেই সন্ত্রাস উৎপাটিত হতে পারে।

আধুনিকতায় বিজ্ঞান

আঁখি ভুষণ ভৌমিক

প্রাচীন প্রবাদসম সপ্তম আশ্চর্য ডিঙ্গিয়ে বিজ্ঞান চলে এসেছিল আরও শতাব্দীকাল পূর্বে। বিশ শতকের অত্যাধুনিক যুগে আশির দশকে বিজ্ঞান আরও একবার 'ওভারটেক' করেছে বিভিন্ন মাধ্যমে। বিজ্ঞানের আশির্বাদপুষ্ট সর্বশেষ মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে Communication বা যোগাযোগ। আজকের দিনে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে জল, স্থল ও মহাশূন্যে। এ তিন এর মাঝ দিয়ে আরও একটি সর্বাধুনিক মাধ্যম অত্যন্ত দ্রুত, দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করছে। এ মাধ্যমটি হচ্ছে টেলিযোগাযোগ বা Telecommunication অর্থাৎ দূরকথন মাধ্যম বা Telephone.

Telephone is an instrument for or the system of transmitting the sound of the voice to a distant hearer.

উল্লেখ্য, প্রাচীনকালে ব্যক্তি থেকে ঘোড়ার ডাকের প্রচলনের পর 'টেলিগ্রাম' ও 'টেলিগ্রাফ' পদ্ধতি চালু হয়েছিল। টেলিগ্রাম হচ্ছে তাড়িত বার্তা আর টেলিগ্রাফ হচ্ছে তড়িৎ সাহায্যে দূরে সংবাদ প্রেরণের যন্ত্র।

'টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের' সমন্বয় সংযোগে আরও একটি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ছিল টেলিপ্রিন্টার (Teleprinter) অর্থাৎ টেলিগ্রাফ দিয়ে চালিত প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে টাইপ (Type) করে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ।

Teleprinter is a Telegraph instrument for transmitting messages by typing over the Telephone Exchange system.

এ টেলিপ্রিন্টারের সংক্ষিপ্ত এবং সুপরিচিত নামই হচ্ছে টেলেক্স TELEX। এই টেলিপ্রিন্টার বা টেলেক্স এর সর্বশেষ সংযোগ মাধ্যম হচ্ছে টেলিকমিউনিকেটর (Telecommunicator) বা গ্রহণ ও প্রেরক যন্ত্র; যার প্রচলিত নাম টেলিফ্যাক্স (Telefax) বা সংক্ষেপে ফেক্স (FAX) যন্ত্র। টেলিকমিউনিকেশনের সাহায্যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাড়িত হয় ফ্যাক্স যন্ত্র।

A Fax is the latest Telecommunicator for the facsimile system of transmitting words of the letter to a distant Telefax Communicator from any corner of all over the world.

আমাদের বাংলাদেশে বিজ্ঞানের আশির্বাদপুষ্ট বিশ্বের সর্বশেষ অত্যাধুনিক প্রচলিত ফ্যাক্স (FAX) কি, কেন এবং কেমন করে ব্যবহৃত হচ্ছে তা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শতকরা আশি ভাগ লোকেরই অজানা। ইদানিংকালে আপামর জন সাধারণ ফ্যাক্স ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং এর পরিচিতি বাড়ছে। বর্তমান বিশ্বে টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিপি, কম্পিউটার যেমনি করে প্রচার ও ব্যবহৃত হচ্ছে তেমনি ফ্যাক্স মাধ্যমটি ও অতি দ্রুত পরিচিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে।

ফ্যাক্স (FAX) কি?

ফ্যাক্স হচ্ছে টেলিফোন সংযোগে বিদ্যুৎ চালিত সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড ইলেকট্রনিক মেমোরি সিষ্টেম অটো—কপিয়ার যন্ত্র। পৃথিবীর যে কোন স্থান হতে লিখিত সংবাদ বা মুদ্রিত শব্দাবলীর অবিকল অনুলিপি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়। ফ্যাক্সের মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন প্রাপক এবং প্রেরকের সুপরিচিত ও জ্ঞাত টেলিফোন নম্বরের ন্যায় টেলিফ্যাক্স বা ফ্যাক্স নম্বর। টেলিফ্যাক্স বা ফ্যাক্স লাইন সম্পূর্ণ স্যাটেলাইটের উপর নির্ভরশীল। ফ্যাক্স এর Facsimile message মূলতঃ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে গ্রহণ—প্রেরণ ও আদান—প্রদান করা হয়ে থাকে।

ইথার তরঙ্গে তার—বেতারে Facsmile message আগমন—নির্গমনে সময় ক্ষেপন ও নির্ধারণ সম্পূর্ণ ধরা ছোঁয়ার উর্ধ্বে। অটো পদ্ধতিতে গ্রাহকের ইপ্সিত লক্ষ্যস্থলের সঠিক নম্বর—তারিখ—দিন—ক্ষণ নির্ধারণপূর্বক প্রদর্শিত বা Exhibit or display হয় এবং ছক বা প্রফর্মা আকারে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য Activity Report বেরিয়ে আসে।

Fax is very much sensitive and sophisticated natural communicator.

ব্যক্তি থেকে সরকারী, বেসরকারী, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত চিঠিপত্র ও সংবাদ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে অতিদ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে অবিকল অনুলিপি প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়। স্পষ্টত এটি বিজ্ঞানের আশির্বাদপুষ্ট একটি অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরংকুশ বিজয় এবং যথার্থ সাফল্য।

যুব সম্প্রদায়ের নৈতিক অবক্ষয়

আনোয়ারা হোসেন
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
পোড়াদিয়া ওয়াসিম উদ্দিন খান ডিগ্রী কলেজ।

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন, ভাল হয়ে চলি"

কিন্তু আজকের এ পরিবেশে, এ মিশ্র পরিস্থিতিতে, চারিদিকের এ বিশৃংখল অবস্থায় ভালভাবে চলার উপায় কি? শিক্ষাংগনে অস্থিরতা, কল—কারখানা, অফিস—আদালতে বিশৃংখলা, যাতায়াত ব্যবস্থায় নৈরাজ্য এ সবের মাঝে আমরা আজ দিশেহারা। এ থেকে কি পরিত্রাণ নেই? সুস্থ স্বাভাবিক জীবন প্রণালীতে কি ফিরে আসা যাবেনা? এর সমাধান খুঁজতে গেলে আমাদের খুব সাবধানে এর সুত্র ও সমাধানের উপায় আবিষ্কার করতে হবে। নতুবা বিপদ অনেক। সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যদি বিস্তারের মুখে বাঁধা না পায় তা হলে গ্রাম, নগর এমনকি সমগ্র দেশ জ্বালিয়ে দিতে পারে।

চারিদিকের এ অস্থির পরিবেশে আমাদের তরুণদের যেন লক্ষ্যহীন যাত্রা। আমাদের ঐতিহ্য অথবা মহৎ আদর্শকে সামনে রেখে সেই পথে যাওয়া পদে পদে হয় বাধাগ্রস্ত। জীবনকে তারা মুল্যায়ন করে খন্ডিত ভাবে, গ্রহণ করে আপেক্ষিক ভাবে। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনে চারিত্রিক গুণাবলীর অনুশীলনে রয়েছে অনীহা। কোন বিষয়কে গভীরভাবে জানার পরিবর্তে নোট বইয়ের পাতা মুখস্ত করতেই তারা অভ্যস্ত, কারণ বিদ্যা তাদের নিকট জ্ঞানের জন্য নয়, অর্থের জন্য, চাকুরীর জন্য। তাই ডিগ্রী লাভের জন্য বই এর পাতা মুখস্ত করতে হয় অথবা আশ্রয় নিতে হয় নকলের।

আধুনিক তরুণ তরুণীরা ভাল—মন্দ বিচার বিবেচনা বাদ দিয়ে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে পাশ্চাত্য ঢং —এ পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার আরম্ভ করেছে। অন্ধভাবে অনুকরণ করে চলেছে ছায়াছবির নায়ক নায়িকাদের। একবার তাদের ভেবে দেখার সময় নেই যে ইংরেজী ফ্রী ষ্টাইল আচার আচরণ অথবা হিন্দী ছবির উগ্র আবেদন প্রকাশের মাঝে অনুকরণের কিছু নেই। তরুণ সমাজের মধ্যে যেভাবে অনুরকরণ প্রিয়তা বেড়েছে তাতে ভবিষ্যতে আশংকা করার মত কারণ রয়েছে। দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে স্রষ্টা আলাদা বিচার বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখেই তাদের চলা উচিত।

এখন এই বিংশ শতাব্দীর নীতি বোধের কোন প্রশ্নই আসেনা। আজ নৈতিক অবক্ষয় এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে আমাদের তরুণ সমাজকে ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব। আগের দিনে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকেরা আফিম, গাঁজা খেতো, কিন্তু এটা গুটি কয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বাইরের লোকেরা সহজে জানতে পারতো না। আর আজ ১০/১১ বৎসরের ছেলেরা হিরোইন বিক্রি করে। ১৪/১৫ বছরের ছেলে মেয়েরা প্যাথেডিন নিতে শিখেছে। তারা আজ এত বেশী মাদক আসক্ত হয়ে পড়েছে যে তাদেরকে সুস্থ পরিবেশে ফিরিয়ে আনা সমাজের পক্ষে কঠিন। তারা দিন দিন নৈতিক মুল্যবোধকে হারিয়ে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ সুন্দর হলে সামাজিক বিধি—নিষেধ কঠোর হলে কোন তরুণ তরুণীর পক্ষে মাদক দ্রব্য গ্রহণ সহজে সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আজ কতটুকু সুস্থ ও স্বাভাবিক? সমাজে এখন সৃষ্টি হয়েছে ভারসাম্যহীনতা।

কিন্তু আমাদের তরুণ তরুণীরা এসব মাদক দ্রব্য পাচ্ছে কোথায়? কারা যোগাচ্ছে? এ ধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারছে? আজ আর কারো অজানা নয় যে দেশে এখন চোরাচালানী ও দুর্নীতিবাজদের বেজায় দাপট। তাদের সঙ্গে রয়েছে রাঘব বোয়ালেরা। কাজেই তাদের ব্যবসা অবাধে চলছে। সব জেনে শুনেও প্রতিবাদ করার সাহস কারো নেই, কারণ মুখ

খুললেই মৃত্যু অনিবার্য্য। দেশে অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে বড় রকমের প্রতিরোধ গড়ে না ওঠার এটাও একটা বড় কারণ।

আজকের তরুণ সমাজকে বিপথে চালিত করছে তারাই যারা সমাজ বিরোধী। আজ আমাদের সবাইকে মিলিত ভাবে এই ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করতে হবে মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য। মাদক দ্রব্য অপব্য—বহারের ভয়াবহতা সম্বন্ধে গণচেতনা বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে যে প্রচেষ্টা চলছে তা আরো জোরদার করতে হবে।

বাংলাদেশের মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ও চোরাচালানকে বর্তমান সরকার জাতীয় সমস্যারূপে চিহ্নিত করছে। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নারকটিক্স এন্ড লিকার ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ, বিডিআর নিয়মিতভাবে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু সরকারী ভাবেই নয় সামাজিকভাবেও সংগঠিত হয়ে মাদকশক্তির বিরুদ্ধে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ অবক্ষয়ের গভীরে প্রবেশ করে মূল্যায়ন করতে হবে এর কারণ কি, কেন তারা বেছে নিয়েছে এপথ। পারিবারিক জীবনে পিতা—মাতাকে হতে হবে আরও সংযত। সতর্কতার সাথে সমবেদনা, সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে মাদকাশক্ত তরুণদের মনের গভীরে অনুশোচনা বা অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। এর সাথে মাদকাশক্ত নিরাময় কেন্দ্র গড়ে তুলে সেখানে চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁদেরকে সারিয়ে তুলতে হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, কলকরখানা, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের নির্ধারিত বিষয়ে অনুশীলন ও পরিচর্যার পাশাপাশি চরিত্র গঠন ও নৈতিক অবক্ষয় রোধ সম্পর্কে সতর্কতার সাথে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারলেই যুব সম্প্রদায়ের নৈতিক অবক্ষয় রোধ সম্ভব।

স্বাধীনতা

মোঃ মোফাজ্জল হক
ক্রীড়া শিক্ষক
পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

খুব সাদামাটাভাবে বলতে গেলে স্বাধীনতা মানে মানুষের ইচ্ছা প্রকাশের অবাধ অধিকারকে বোঝায়। তবে কারো ইচ্ছার প্রকাশ যদি অন্যের ইচ্ছা প্রকাশকে ব্যাহত করে কিংবা তা এমন হয় যে অন্যের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে তবে তার নাম স্বাধীনতা নয়। ফলে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে স্বাধীনতা বল্গাহীন কোন ঘোড়া ছুটে চলার অধিকার নয়। এর অপ—প্রকাশকে রোধ করার জন্য আছে কিছু নিয়ম কানুন বিধি বিধান। এসব নিয়ম কানুনের রশি ধরা থাকে পরিবারের হাতে, ধরা থাকে সমাজের হাতে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের হাতে। উদ্দেশ্য একটি সুশৃংখল ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা। যেন একের অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতা নড়িয়ে না দিতে পারে সমাজের ভিত, নড়বড়ে করে না দিতে পারে রাষ্ট্রীয় শৃংখলা। সেজন্যই নানা অলিখিত লিখিত আইন আরোপ করা থাকে মানুষের উপর।

স্বাধীনতা বিষয়টিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। (১) পারিবারিক স্বাধীনতা (২) সামাজিক স্বাধীনতা (৩) রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। মাতৃক্রোড় থেকে পারিবারিক বৃহৎ অংগনে এর প্রথম চর্চা শুরু হওয়ার সুযোগ থাকা উচিত মানুষের। মানুষের ব্যক্তিত্ব, চাল চলন, কথাবার্তা এবং সর্বোপরি মানুষের মূল্যবোধ মূলত গড়ে উঠে তার পারিবারিক অংগনেই। কোন পরিবারে কোন সন্তান মত প্রকাশে কতটা স্বাধীন, তার মতামতের মূল্য কতটুকু তা নির্ভর করে সে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের দৃষ্টি ভঙ্গি কিরকম তার উপর। মূলত বাবা মার চিন্তা চেতনা সন্তানদের মন মানসিকতা সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। অশিক্ষিত হয়েও কোন কোন বাবা মা যথেষ্ট স্বাধীন চেতা হতে পারেন আবার শিক্ষিত মা বাবা ও চিন্তা চেতনায় পশ্চাৎপদ থেকে যেতে পারেন। মূলকথা চিন্তা চেতনায়, মন ও মননে পরিবারেই যে সন্তান পশ্চাৎপদ থেকে যায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল্যায়ন ও এর সুফল পাওয়া তার কাছে অসম্ভব থেকে যায়। অবশ্য প্রায় সব পরিবারের কিছু নিজস্বতা থাকে কিছু পছন্দ অপছন্দ ভাল লাগা না লাগা থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে সন্তান তা—ই নিজের মধ্যে ধারণ করে ফেলে তার নিজের অজান্তেই। পরিবারের কর্তা কর্তৃর দৃষ্টি ভঙ্গিই সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে পরে বহু ক্ষেত্রেই।

মানুষ কেবল পরিবারেরই সন্তান নয়। সে একটি সমাজেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে সামাজিক নিয়ম—কানুন, অণুশাসন এসব তাকে যথাসম্ভব মেনে চলতে হয়। মানুষের বল্গাহীনতার প্রথম বাঁধা পরিবার হলেও দ্বিতীয় বাঁধা হলো সামাজিক আইন কানুন। অলিখিত কিন্তু প্রচলিত। কোন সমাজ ব্যবস্থা যদি এরকম হয় যে তা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে তবে সে পরিবেশে লালিত মানুষ চিন্তা চেতনায় অনগ্রসর হবে তাতে আর সন্দেহ কি? ধর্মীয় অন্ধত্ব এবং কুসংস্কার যে সমাজকে আচ্ছন্ন করে রাখে সে সমাজের মানুষ চিন্তা চেতনায় আধুনিক হবে, কর্মকান্ড তার সৃষ্টিশীল হবে এ কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তব। স্বাধীন চিন্তা ভাবনা, গতিশীল কর্মকান্ড আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা তখনই সম্ভব যখন কোন সমাজ এসব কিছুর জন্য প্রয়োজনীয় উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখে। স্বাধীনতার মূল্যায়নের জন্য সমাজ ব্যবস্থা অনুকূল না হলে সে সমাজে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ব্যহত হতে বাধ্য। অবশ্য সামাজিক অণুশাসন কখনো কখনো ব্যক্তির

বল্গাহীনতায় রশি টেনে ধরে সমাজকে কলুষমুক্ত রাখার সফল প্রয়াস রাখতে সক্ষম হন। মানুষ যেন সহজে বিপথগামী না হয়, যেন সামাজিক মুল্যবোধকে ধুলায় লুণ্ঠিত না করতে পারে সেজন্য সামাজিক বিধি নিষেধ বেশ আষ্ট্রেপৃষ্ঠে বাঁধবার চেষ্টা করে সমাজের প্রতিটি সদস্যকে। মূল কথায় সমাজ যদি অনগ্রসর হয় তবে তা মানুষের বিকাশকে রহিত করে আর সমাজ যদি প্রগতিশীল হয় তবে তা মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের পথকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

পরিবার সমাজ এসব মিলে আরো বৃহত্তর পরিবেশ আছে মানুষের। তা তার রাষ্ট্রীয় পরিবেশ। রাষ্ট্রের থাকে লিখিত সংবিধান। থাকে লিখিত আইন কানুন। এসব মেনে চলতে হয় প্রতিটি সচেতন নাগরিককে। রাষ্ট্রের জন্য হুমকী স্বরূপ যে কোন কাজকেই কঠিন হাতে দমন করার অধিকার রাষ্ট্র রাখে। অতএব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচারণের অধিকার কোন নাগরিকেরই নেই। তাছাড়া যেসব কাজ আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়, গর্হিত সেসব কাজ করার স্বাধীনতা কারও নেই। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেওয়া মানে হলো স্বেচ্ছাচারিতা। রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংশ্লিষ্ট অংগ—এর বিচার করার অধিকার রাখে। আসল কথা সাধারণ দৃষ্টিতে যা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়, যা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক বলে মনে হয়, যে সব আচার আচরণ অশালীন বলে প্রতিভাত হয় সে সব করার অবাধ অধিকার কারও নেই। তবে এ কথা ঠিক রাষ্ট্রের সংবিধানের মূল স্তম্ভ কি কি তার উপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকের চিন্তা ভাবনা কোন পথে প্রবাহিত হচ্ছে তার আভাষ মেলে। সংবিধান যত আধুনিক ও যুগোপযোগী হবে সে রাষ্ট্রের নাগরিকের চিন্তা চেতনা ততটা প্রগতিশীল ও আধুনিক হবে। সংবিধান মানুষের অধিকারকে সংরক্ষণ করে। মানুষের স্বাধীনতার রক্ষা কবচ তাই এটি। অবশ্য স্বাধীনতা সচেতন হওয়ার জন্য মানুষকে স্ব—শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। সকল শিক্ষিত লোকই সুশিক্ষিত নন। কেউ কেউ তো বটেই। স্ব—শিক্ষিত লোকই কেবল চিন্তাকে শানিত করতে জানেন, দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করতে জানেন, কর্ম হয় তার বুদ্ধি তাড়িত। যে রাষ্ট্রে সুশিক্ষিত লোক যত বেশী সে রাষ্ট্রের মানুষ তত স্বাধীন। সে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা তত সুসংহত।

নালী বিল

ইউনুছ আলী ভূঞা
প্রাক্তন প্রধান
বাংলা বিভাগ, নরসিংদী কলেজ।

ওগো নালী বিল! শ্যামল, মলিন
কেন বা হয়েছ তুমি,
তোমার তীরেতে বেনুবন গুলি
উঠেছে গগন চুমি।
নিবিড় বনানী হ'য়েছে এখন
তোমার শ্যামল তীরে,
ঘুঘু ডাকে নিতি প্রদোষে—প্রভাতে
বেদনার বুক চিরে।
কৃষাণ মেয়েরা দলে দলে আসি
তোমার সে বনভূমে,
আঁচল ভরিয়া বৈচী তুলিছে
দুপুরের মরসুমে।
কাল বনে বনে নীড় রচিতেছে
টুনটুনী পাখী এসে,
ময়না পাখীর শিস্ ভেসে আসে
বাউল বাতাসে মিশে
কল্‌মি ডগায় ছেয়ে গেছে ঐ
বিল ভরা কালো জল,
মৌমাছি রোজ আহরণ করে
পদ্মের পরিমল।
শালুক তুলিয়া ভাগ করে নেয়
রাখাল ছেলের দল,
ভয় করে' সবে যায় না'ক মাঝে,
ভয় করে কালো জল।
তোমার ঘাটেতে ভিড় করে এসে
পল্লীর মেয়েগুলি,
কল্‌মীর সনে কয় যেন কথা
চাহেনা নয়ন তুলি'।
সাঁঝের বেলায় দুই তীর ভরে
জোনাকী জ্বালায় আলো,
কেয়াবন তলে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে হায়—
কত যেন লাগে ভালো।
"ফিঙে পাখী, পুচ্ছ নাচায়
বাবলার ডালে আসি।
চখার বিরহে চখী কেঁদে মরে
অশ্রু—সায়রে ভাসি।
গভীর নিশীথে তোমার কিনারে
কে জানি কাহারে ডাকে;
"নল্লু, নল্লু"—বলে অবিরত ডাকে,
বুড়ী সেজে বসে থাকে।
কেউ বলে—সেথা পরী বাস করে
নিঝুম বনানী মাঝে,
সারারাত ভরি, নূপুর তাদের
থাকিয়া থাকিয়া বাজে।
কেউ বলে—সেথা গোলাপ ফুলের
গন্ধ আসিছে ব'য়ে,
পরীরাই বুঝি গোলাপের বেশে
নাচে উন্মন হয়ে।
কেহ বলে—রাতে স্বরগ হইতে
নেমে আসে যেন কেহ,
শ্মশান হইতে আসে তাঁর কাছে
প্রাণহীন শত দেহ।
একদা আমারে গাঁয়ের বৃদ্ধ
কহিল নিভৃতে ডাকি;
"ওসব কাহিনী সকলি মিথ্যা
সকলি অলীক, ফাঁকি।
নালী বিল এর নাম হ'ল কেন—
বলে দিব আমি সবে,
দেড়শ' বছর বয়স আমার
মিথ্যা নাহিক হবে।
এই বিল তীরে, বেনুবন তলে
একটি ছিলো যে বুড়ী,
দেখিতাম আমি ঘর খানি তার
বয়স যখন কুড়ি।
সাথে ছিল তার একটি নাতনী
বয়স আট কি নয়।
তিলেক তাহারে ছাড়িয়া থাকিতে
লাগিত বড়ই ভয়।
'নল্লু' বলে তারে ডাকিত সকলে
আদর করিয়া অতি,
নেচে নেচে সে যে পথ চলে যেতো
মনের হরষে মাতি।
সদাই যেন গো চঞ্চলা অতি
বন হরিণীর মত,
কথায় কথায় আবদার করে
দিদিমার সনে শত।
কুটিরের দ্বারে নিতুই সাঁঝেতে
ফুটিয়া থাকিত ফুল,
মালা গেঁথে সে যে নিজেই পরিত
কত যেন ক'রে ভুল।

একদা সাঁঝেতে গোলাপ তুলিয়া
গাঁথিল একটি মালা
আপনি গাঁথিয়া আপনি পরিল—
দশদিক্ হল আলা।
নিঃঝুম রাতে জেগে ঘুম হ'তে
কাঁদিয়া উঠিল জোরে—
'আমার গোলাপ নাই মোর হেথা—
কোথায় গিয়েছে পড়ে।'
বুঝাইল বুড়ী, 'কাদিওনা, দিদি;
ঘুম ভোলা যাদু মোর,
দুইটি গোলাপ এন দিব তোমা'—
এখনি হইলে ভোর'।
অবুঝ বালিকা মানিল না হায়,
ঘুম থেকে উঠে জেগে,
ভরা বরষার বিলের বুকেতে,
ঝাঁপিয়ে পড়িল বেগে
ঘূর্ণী সে জলে—নিয়ে গেল তারে
কোথায় সুদূর পুরে,
জানে নাক কেহ।—বুড়ী সেই হ'তে
পাগলিনী সম ঘুরে,
লোকে বলে—হায়, মরে গেছে বুড়ী
দারুন মনের দুখে,
নীরবে কখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে
গভীর বিলের বুকে।
এমনি করিয়া ডুবে গেল "নলু,"
মরে গেল বুড়ী হায়।
কেহ বলে—বুড়ী এখনও তাহারে
খুঁজিছে তরুর ছা'য়।
নলুকে স্মরিয়া 'নালী বিল' আজ
নাম ধরিয়াছে ভালে—
'নালী বিল' নাম প্রচার হইল
যুগে যুগে, কালে কালে।
এখনো সাঁঝেতে নালী বিল তীরে
কে জানি কাহাকে ডাকে
কেউ বলে —বুড়ী প্রতিদিন রাতে
নাতনীকে খুঁজে থাকে।

* এই বিলটি ঢাকা সদর জেলার অন্তর্গত "চর মান্দালিয়া" গ্রামে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদের একটি শাখা গ্রামটিকে দক্ষিণ তীরে রেখে —বয়ে গিয়েছে। গ্রামটা অতি প্রাচীন এবং অনেক উপকথার জন্মভূমি।

নামায

আলহাজ্জ মোহাম্মদ আবু তাহের
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক
পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়।

নবীর মে'রাজ
কী অভিনব কাজ।
অসীমের সাথে সসীমের দিব্য মোলাকাত,
লভিতে বেহেশতী সওগাত।
তাই আল্লাহর ফরমান,
করতে অভিযান,
অনন্ত অসীম পথে আল্লাহর দরবার,
আশেক মাশুকে হবে যে দীদার,
অভিসার স্থান—আরশ আল্লাহর
অফুরন্ত নূরে গোলজার,
আহা স্রষ্টার কি করুণা অপার।
বান্দার নামায,
এ যে দুনিয়ায় সেই মে'রাজ,
এরই মাঝে হয় আল্লাহর দীদার।
এ দীদার নয়—সেই আল্লাহ—মোস্তফার,
এই যে ভবের মাঝার,
মা'বুদ চরণে আত্ম বলিদান
প্রনত বান্দার।
সৃষ্টির অপার অচিন্ত্য লীলা,
এ বুঝা ভার,
আল্লাহর খলীফা আদম সন্তান,
যার তরে সৃষ্টি এই সৃষ্টি —জাহান,
তারি সাথে স্রষ্টার সৃষ্টি—অঙ্গীকার,
তার বন্দেগীই হবে জীবনে জিন্দেগী সার।
নামাজ—এই যে সেই বন্দেগী,
জিন্দেগীর কল্যাণ নিয়ন্ত্রণ
এই যে খোদার তরে বে—খোদী
এতে হয় খুদীর বিলোপ—সাধন।
তাই বান্দা তার কল্যাণ,
তার জীবন—স্বাদের তরে,
মা'বুদ সামনে হাজির, নাজির,
দিতে সেজদা, নোয়াতে শির।
দুনিয়ার যা কিছু,
আমারে ডাকিছে পিছু,
কত মোহ, কত মায়া

কত মোহিনী রূপের কায়া,
ধরি অপরূপ রূপ
ধাঁধায় ফেলেছে আমার স্বরূপ,
এসব জঞ্জাল করি পরিহার
ওগো পরওয়ার দিগার
তোমার মিলন বিধুর বান্দা হাজির,
আজি তোমার দরবারে।
ওগো মাওলা
এ বান্দার সর্বস্ব তোমায় করেছে যে হাওলা।
শত অপরাধে অপরাধী,
এই যে কয়েদী
খাড়া আজ তব আরতি মন্দির,
তোমার করুণা খিঘারী
এই যে পূজারী।
তোমার বিরহ জ্বালা,
আমারে করেছে উতালা,
আমি নামাযী—তোমার প্রেম—পাগলা
তোমার স্বরণ,
আমায় করেছে উচাটন,
তাই হাজির এই আকিঞ্চন
তোমার সদন।
তোমার করুনা ফোরাৎ,
এ পাপ—মৃত দেলে,
আনবে আবে—হায়াৎ।
ওগো রাহমান, রাহীম,
"আল্লাহ আকবর",
এই তকবীর তাহরীম
চিত্তে এনেছে কি আবেগ ঝংকার
ভক্তি প্রণত শিরে দিতে সেজ্‌দা,
তোমার নিরাকার।
ভক্তিপ্লুত অন্তর নিয়ে,
শুদ্ধ করি তনুমন,
শুদ্ধ করি গা—আবরণ।
হারাম করিলাম
দুহাত উঠায়ে
ডানে বামে ইশারা দিয়ে,
যা কিছু আছে দুনিয়া জাহান।
আমি রিক্ত, আমিত্ব হারা,
প্রাণপাখী ছেড়ে দিয়ে
দেহ পিঞ্জিরা,
মাওলা প্রেমে পড়েছে ধরা।
ওগো প্রভু।
মুখে মোর। তব স্তুতি গান,
দেলে তব অরূপ—রূপের কল্পনা—ধ্যান
হাত দুটি —বাঁধা, তব প্রেম—নিগড়ে,
এ বান্দা, এ নামাযী হাজির আজি,
তোমার দরবারে।
বান্দার এই অজুদ,
বিলায় তোমায়,
ওগো মা'বুদ
এই শির, এই উচ্চ শির,
এই চক্ষু, এই নীর,
সব যে আজ তোমায় সজুদ,
আকুল প্রাণের ব্যাকুল ডাক,
তব দরবারে হে মা'বুদ' পাক,
তৃষিত পরাণ করুক পান
তোমার করুণা বারি।
হে সর্ব অধিকারী।

I remember

Prof. Abdul Kadir
Barachapa College
Ex-Headmaster,
Poradia Model High School.

Those sweet days are gone by
I remember plucking of 'Bukul' flowers
Fallen by the river side.
I remember the wise says of Moulvi of
Kalika Proshad
I remember the loitering of Suren Bubu
Putting on 'Chadar' in the summer-heat.
I remember Bhuiyan Shahib, the undying soul,
Whose contribution spread the light of education
Among the rural people.
I remember the humour of Yakub Ali master
And the fine 'Duti' of Yunus Shahib
To the end, to the end,
I remmber those sweet days.

ফাগুন

মোঃ রুস্তম আলী
শিক্ষক, গোবিন্দ্রপুর সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

শীতের শেষে ফাগুনের
হাওয়া বয়ে যায়
গাছের পাতারা ঝরিছে
নব ফাল্গুনী বায়,
পুরানো পাতা ঝরে যায়—
নবকিশলয়ের আগমনী গান
বাসন্তী বাতাসে ভেসে বেড়ায়।
মাঠে মাঠে থাকে না ধান,
দোয়েল কোকিল
ডাকে বনে বনে,
কৃষক বৃষ্টির তরে
তাকায় আকাশ পানে।
এমন দিনে পানি থাকেনা
খাল বিলে,
তাই মাঝি তার 'না' নিয়ে গেছে
বড় নদীর জলে।
ফাগুনের শুরু মৌসুমী বায়ু বহে
শীত নিয়েছে বিদায়, কোন অজানা পথে,
শীতের হিমেল হাওয়া
বিদায় নিয়েছে পুষ্পক রথে।
গাছে গাছে প্রতি ডালে
গজায় নূতন কুঁড়ি,
ঝরা পাতা কুড়ানোর ধুমে
মও যত গৈয়ো ছুড়ি।
প্রখর রোদের ঝাঁঝে
ছোটে আগুনের হলকা
পথ ঘাট জুড়ে উড়ে
ধুলি যেন নীড় হারা বলাকা।
দোয়েল, কোকিলের মধুর তাল
শুনি বন মাথায়
সকলের হৃদি
চিত্ত হারিয়ে গান গায়।

এরই নাম স্বাধীনতা!

মোছাঃ তাহমিনা সুলতানা
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)
পোড়াদিয়া ওয়াসিম উদ্দিন খান কলেজ।

লোহার খাঁচায় বন্দী পাখিটা।
জন্ম থেকেই মুক্তির দ্বারে করাঘাত হানছে
হাত—পা বাঁধা বদ্ধ শৃংখলে।
ডেডবডির পঁচা দুর্গন্ধ
নিষ্পেষিত হৃদয়ের কলুষমুক্ত হাতছানিতে ম্রিয়মান।
একটি ভোরের স্বপ্নে বিভোর—
কলংকিত অধ্যায়ের শেষ রজনীর অবসান চায়।
চায় মুক্ত প্রাণের আবেগে—
দিশেহারা মাতার চিবুক ছোঁয়া আশীর্বাদ।
দোয়া করো।
যেন ফিরে আসতে পারি—
তোমার কোলে বুক ভরা আশা নিয়ে।
তোমার স্নেহের দোলায় মন আজ আনন্দে নাচে।
গাইব গান, ছড়া কাটব—
ঘুমিয়ে পড়ব ঘাসের পাতায় পাটি বিছানো আঙ্গিনাতে।
এই ছিল আশা।
সেকাল একাল সবকালেই মাতা তুমি বিভ্রান্ত,
কানে কানে পাখিটা বলে—
লালের আচড় আর কত পড়বে?
তোরা জেগে উঠ। চেয়ে দেখ সূর্য উঠার কত দেরী।
রাত্রি তো পোহাল না।
যে আমার সোনালী দেহটাকে—
খুনের রং—এ আভাসিত করেছে—ষোড়ষীর দেহটাকে—
পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে।
কাফনের পাতা মাথায় বিছিয়ে—সেই পশুরাজ দেবতা।
ইনডেমনিটি কই। তাকে হত্যা কর।
ধ্বংশ কর। আমি দেখব।
একবার পাখিটাকে আলো দেখতে বলেছিল—
ফিরে চেয়েছিল অতীত।
পিতার হত্যা। ন্যায়ের বিচার।
দেহলোভী পিশাচ। 007 U. S. A খাতার হিরো।
কতগুলো ভেড়ার দলের প্রতিষ্ঠাতা।

কই। মাত্র তিনটি মাস পরে
বিউটি পার্লারের অন্যতম মহিয়সী পিশাচদের জায়া
মাথার মনি।
রাত পোহাবার পূর্ব লগ্নেই কালো মেঘে ঢেকেছিল
আকাশটা
বজ্রের চমকানিতে —সবই লাল হয়ে উঠল
সাথে করে বর্ণমালার শেষ ধাপটাও।
কতগুলো শকুন টেনে হিচড়ে শেষ করল শবদেহ।
মাথায় বাজ পড়ল অসহায় দুর্বল প্রাণীগুলির।
অর্ধমৃত পাখিটা আজ লোহার খাচায় বন্দী—
অধ্যাদেশ—গন্ধে অসহায় মানুষগুলো
মাংসলোভী ব্যাঘ্রের মুখে থুবড়ে পড়েছে।
অস্তসত্তা! কলংকের ছাপ পড়েছে নিথর দেহে।
তেলের গন্ধে ভূত পালায় আর
ক্ষুধার গন্ধে সম্বলহীন দরিদ্র মানুষগুলি ছুটছে,
হয়েছে দিশেহারা। আর ঘটেছে মৃত্যু।
এরই নাম স্বাধীনতা।

Some—কিছু

মোঃ রইছ উদ্দিন আকন্দ
প্রদর্শক, পোড়াদিয়া ওয়াসিম উদ্দিন খান কলেজ।

প্রথম—Frist
আরম্ভ—Start
Second মানে দ্বিতীয়
মৃত্যু—Die
মিথ্যা—Lie
Third অর্থ তৃতীয়।
Pond—পুকুর
Dog—কুকুর
বিড়াল ইংরেজী—Cat,
Jackal—শিয়াল
Wall—দেওয়াল
মোটা ইংরেজী Fat.
Car—গাড়ী
House—বাড়ী
Book অর্থ বই
Take—লও
Eat—খাও
That মানে ঐ।
I—আমি
You—তুমি
He অর্থ সে,
My—আমার
Your—তোমার
তাহারা ইংরেজী They.
Father—পিতা
Mother—মাতা
Sister মানে বোন,
ভাই—Brother
অন্যান্য—Other
Angle অর্থ কোণ।
Go—যাও
এখন—Now
Come মানে আসা,
Gone—গেছে
আছে—Have
Language অর্থ ভাষা।
Cut—কাটি
Mud—মাটি
Canal অর্থ খাল
Water—জল
Machine—কল
Sail মানে পাল।
গল্প—Tale
লেজ—Tail
Tell মানে বলা।
Fair— মেলা
Loose—ঢিলা
Walk অর্থ চলা।
Judicious—বিজ্ঞ
Ignorance—অজ্ঞ
Fare মানে ভাড়া,
জোর—Might
দৃশ্য—Sight
Except হল ছাড়া।
Cell—কক্ষ
Chest—বক্ষ
Sell মানে বিক্রয়
Country—দেশ
End—শেষ
Purchase অর্থ ক্রয়।
Good—ভাল
Black—কালো
Well মানে শেষ
গাছ—Tree
মুক্ত— Free
Finish অর্থ শেষ।

নারী শিক্ষা

মিস্ রৌশন আরা
নবম শ্রেণী
পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়।

নর ও নারীর সমন্বয়ে মানব জাতি,
এ দুয়ের প্রচেষ্টায় ক্রমে জগতের অগ্রগতি।
শিক্ষার আলো থেকে যদি নারী থাকে বঞ্চিত,
হবে না হবে না প্রত্যাশা সাধিত।
শোন হে সুজন
খামোখা করোনা কুজন
মানুষের অর্ধেক নারী
পিছে ফেলে তারে
সাজাবে কেমন জগৎ, ভাবিতে পারি।
চাও যদি করিতে আদর্শ জাতি গঠন
নারীই পারে করিতে এ অসাধ্য সাধন।
আজিকার শিশু ভবিষ্যতের আশা
মাতার প্রযত্নে লভে সঠিক দিশা।
এতো যে প্রতিশ্রুত প্রাণ
গড়িতে তাই হতে হবে যত্নবান।
মায়ের এ দান সুশিক্ষা
শিক্ষিতা মাতার কাছে হবে সন্তানের প্রথম দীক্ষা।
মাতা যদি হন প্রভাময়
সারা জাতি পাবে মানুষ হিরন্ময়।।

নব বর্ষের ছোয়াচ

মোঃ আনোয়ার হোসেন (বাচ্চু)

নব বর্ষ;
তুমি এসেছ কি?
নবীন সজ্জা পড়ে নগ্ন রূপ ধরে
দিগন্ত পথ পেরিয়ে
আর চোখে চেয়েছ মোদের দিকে হে নব বর্ষ;
তোমার স্নিগ্ধ শুভাগমনে
কে যেন ডেকে বলে
দিগন্তের পথে শুনি কার ধ্বনি
শুনেছি মৃদু সমিরণে তুমি এসেছ
হে নব বর্ষ;
তোমার হাত ধরে আজ মোদের নবীন করে নাও
হে নব বর্ষ।

এ ভাবে ক'দিন

এম, আনোয়ার হোসেন (খোকন)
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)
পোড়াদিয়া ওয়াসিম উদ্দিন খান কলেজ।

এভাবে ক'দিন
দূরে সরে থাকবে
পৃথিবীটা প্রেমময়,
কেন শুধু মিছে ভয়
মিহি সুরে ডাকবে।
চার দিকে এত গান
প্রাণে প্রাণে ঐকতান
তবে কেন চুপটি।।
জীবনের খেলা ঘরে
খোল তবে মুখটি।

মা

মোঃ আসাদুজ্জামান
মানবিক শাখা।

আমায় তুমি একলা ফেলে
কেমনে যাবে মা,
যাবার বেলায় আমার কথা
একটু ভাববে না?
বাবাকে যে হারিয়েছি
বেশী দিন যে হয়নি,
বাবার মত ফাঁকি দিয়ে
তুমিও যাও চলে,
তখন মাগো কার কোলে
যাব মা বলে।
অপরাধ যদি কিছু হয়েই থাকে
ক্ষমা করে দিও
দোহাই মোগো আবার আমায়
বুকে টেনে নিও।

হে স্বাধীনতা

হাছিনা সুলতানা চম্পা
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)
পোড়াদিয়া ওয়াসিম উদ্দিন খান কলেজ।

অনেক যুদ্ধের পর তোমায় পেলাম, তোমায় পেলাম
হে স্বাধীনতা
পেলামনা আমার জন্মদাতা পিতাকে
পেলামনা আমার গর্ভধারিণী মাতাকে
পেলামনা আমার শিশু ছেলেটি,
যার কথা শুনেছিলাম, শুনেছিলাম সেই যে যুদ্ধ থেকে
কিন্তু ওরা সব কোথায়—।
বলতে পার হে বিশ্ববাসী?
আমি জানি তোমরা বলবেনা
আমি এও জানি ওরা সব প্রাণ হারিয়েছে খান
সেনাদের হাতে
হয়তো অবুঝ ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিয়েছে রক্ত পিপাসু
হিংস্র দস্যুরা।
আগ্নেয়াস্ত্র বেয়নেটের আঘাতে আঘাতে
ক্ষত বিক্ষত করেছে ওর কচি দেহখানি।
হয়তো অন্ধকার রাতে ধরে নিয়েছে আমার স্ত্রীকে
এমন করে বহু নরনারী প্রাণ হারিয়েছে
বুলেটের আঘাতে আঘাতে,
পাশবিক অত্যাচারের বিনিময়ে তোমায় পেলাম
তোমায় পেলাম হে স্বাধীনতা
তবু আজ ধন্য আমি ধন্য বাংলার বার কোটি মানুষ
হে স্বাধীনতা
হে স্বাধীনতা, হে স্বাধীনতা।

হারিয়েছি যে দিন

সাজেদা আখ্‌তার (সাজু)
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)
পোড়াদিয়া ওয়াসিম উদ্দিন খান কলেজ।

আজও বকুল তলায় ঝরে বকুল,
নদীতে আজও উদ্দামতা দোল খায়,
ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা বক আজও যায় উড়ে
আজও বাঁশ বাগানে ডাকে কোকিল বসন্তের
আগমনে।
আজও মাঠ—মাটি দুপুর রোদে করে খা খা
সন্ধ্যা আসে আজও বিশ্ব জুড়ে—নিকষ কালোরূপে
আকাশে উঠে চাঁদ,
চারদিকে স্নিগ্ধতা শুধু।
আজ শুধু বাজেনা সেই গান—রাখালের বাঁশি,
মাঠে মাঠে আজ চড়ে না গরু —শুধু শূন্যতা,
দিন বদলের পালায় বদলে গেছে সব।
মনের গহীন আমার বার বার উঠে গুমরে—
চাঁদের আলোয় বসে গল্প করা আর
ভবিষ্যৎ জীবনের আল্পনা আঁকা—
সব কিছু আজ হয়ে গেছে ম্লান
কোথাও কিছু নেই—সব গেছে শেষ
সীমানায় পৌঁছে,
আজ শুধু সব ভাবনা .....।

নিশিযাত্রা

মাহফজা জাহান মাফু
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)
পোড়াদিয়া ওয়াসিম উদ্দিন খান কলেজ।

যাবে কি মোর সাথে ঝর্না ছুটে কোথা হতে
কোথা থেকে চলা শুরু কোথা তার শেষ
সেথা থাকে উচু—নীচু গগন অনিমেষ।
থামিবে পান্থ পথে দাঁড়াও নিশুতি রাতে
সেথা ময়ুর—পংখী এলো মাথার কেশ
যেথা থাকে একা একা নাইকো ছদ্মবেশ।
ডাক যদি বাড়িয়ে দু'খান হাত নাড়িয়ে
পাগড়ী মাথায় নিথর দেহে আসবে
সে। ভয় পেওনা জড়িয়ে তোমায় কাঁদবে।
নুয়ে যাবে গড়িয়ে পাথর নুড়ি মাড়িয়ে
তোমার সাথে মিতালী আমার চলবে
যখন তুমি শুধু আমার কথা বলবে।
চারিদিক নীরব যখন, ওদের সব
ঘুমিয়ে যখন পড়বে সবে তখন
নিশী রাতে আমরা দুজন করে আলাপন।
যুগল চলে যাব মুঠি মুঠি ফল নেব
হেসে খেলে দুজন সুরহে সন্ধিক্ষণ,

নামব পাড়ে পেরিয়ে কোন শ্রীবৃন্দাবন।
শুনতে যদি দাও যদি আরো কাছে যাও
নিশীতে পাখি ডাকে ঘুম ভাঙ্গার গান
তব সাথে প্রকৃতিটা মিলাবে তার কান।
পেতেই যদি চাও আশায় ভরিয়ে নাও
চন্দ্রিকাতে ভরে দেব তব খেয়া যান
ঘুম পাড়ানী ছড়া কাটে পেতে দিও কান।

তোমায় পেয়ে

মোঃ আনোয়ার হোসেন (আলম)
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)
পোড়াদিয়া ওয়াসিম উদ্দিন খান কলেজ।

সব পেয়েছি তোমায় পেয়ে,
চাই না কিছু আর।
চাওয়া—পাওয়ার সমাহারে—
ঘুচল হাহাকার।
দুরে কোথাও গেলে তুমি,
ভেবে সারা হইগো আমি।
ফিরে এলে হৃদয় মাঝে—
বয়গো খুশির ধার।
হীরা মণির কি দাম আছে,
থাকলে তুমি আমার কাছে।
দেখলে তোমায় বইতে পারি
বিপুল ব্যথার ভার।
সকাল সাঁঝে সকল কাছে,
তোমার কথাই কানে বাজে।
আঁধার রাতে তুমি আমার
বিশাল আলোর ঝাড়।

বিন্নাবাইদ

ফরিদ আহম্মদ অমৃত

বিন্নাবাইদ মোদের জন্মভূমি অতি গর্ভের ধন
সিনান করি ব্রহ্মপুত্রের জলে জুড়ায় তনুমন
সিংহাসন নেই মোদের—নেই রাজধানী—
লাল শাড়ী পরে বধু টানে সংসারের ঘানী
গ্রামের পথ বেয়ে যবে যায় নিজ ঘরে
সিক্ত নয়নে চেয়ে চেয়ে বধু বুকে টেনে ধরে
ঝির ঝির বাতাসে দোলে মাঠের সবুজ ধান
সিন্দুকে নেই টাকা মোদের—আছে অভিমান।
সাদাসিধা মানুষ মোরা, মোদের সরল মন
সিদ্ধি করি মনোতৃপ্তি পেয়ে অল্প ধন
সিঁধ চোর নেই, ডাকাত নেই, আছে টাউট দল
সিদ্ধান্ত নিয়েছি মোরা, ওদের ভাংতে মনোবল
সিগারেট, চা, পান খেয়ে নিজে মোড়ল সাজে
জুয়া খেলে , তাস খেলে কাজ করে সব বাজে
সিংহ গর্জন ভাঙ্গবে ওদের নোয়াবো উঁচু বুক
সিলাই করে সীল করবো ওদের পুরো মুখ
বিন্নাবাইদের ভাই বোন মোরা সহজ সরল মনা
সবাই মিলে সুখে থাকো করি যে প্রার্থনা।

সেই প্রজাপতি

মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
ম্যানেজার
সিএসডি গোডাউন, ঢাকা।

এনেস্থেসিয়ার ঘোরের মধ্যে মৌ আজিমপুর গোরস্থান থেকে বাসায় ফিরেছিল। ঘোর কিছুটা কেটে গেলে সে বার বার নিজকে প্রশ্ন করছে—সফি শেষ পর্যন্ত ওর লাশের দায়িত্বটা "আঞ্জুমানে মফিজুল ইসলামকে" দিয়ে গেল? মৌ না হয় ওর জীবনে চৈত্রের একটা ঝড় ছিল। কিন্তু ওর স্কুল শিক্ষক নিরীহ বাবা, ঢাকায় বসবাসরত ওর বড়লোক চাচা—এঁরাতো ছিলেন? তবে কেন সে মৃত্যুর পুর্বে এমন একটা বিশ্রী অসহায় ইচ্ছা পোষণ করে গেল? তার জীবদ্দশায় ওর মরণোত্তর লাশটাকে বেওয়ারিশের খাতায় তালিকাভুক্ত করে যেতে ওর আত্মমর্যাদা বা বিবেক একবারও বাঁধল না?

পাশের কক্ষে উচ্চ ভলিউমে টিভি চলছে। ঐ কক্ষটিতে সচরাচর ওদের নিকটাত্মীয়দের কেউ এলে ঘুমান। টিভির কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, স্বাস্থ্য বিষয়ক কোন অনুষ্ঠাণ হবে। মৌয়ের কান ঝালা পালা করছে। এ কান্ডটা নিশ্চয় মর্জিনার। সে হয়ত এখন রান্না ঘরে কাজ করছে। অনুষ্ঠান শেষে বিজ্ঞাপন আরম্ভ হলেই সে ব্যস্ত হয়ে টিভি'র সামনে বসে দাড়াবে। মর্জিনা মৌয়ের কাজের মেয়ে। আজকাল সে কাজের চেয়ে সাজগোঁজ আর বিটিভি'র বিজ্ঞাপন নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকে। সে ওর মোটা ভুরুর অর্ধেক তুলে ফেলেছে। সে এখন সকাল—বিকাল চোখে চিকন করে কাজল আঁকে, রঙিন ফিতায় চুল বাঁধে। বিটিভি'র জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনগুলো ওর মুখস্থ। ড্রয়িং রুমে প্রায়ই সে এগুলোর মহড়া দেয়। গত ক'দিন ধরে ওর শাড়ী পরার ও ঝোঁক বেড়েছে। প্রশস্থ ডাইনিং রুম হয়ে এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে খাবার সময় সে প্রিয়"—প্রিয়"—সুন্দরী প্রিন্ট শাড়ীর বিজ্ঞাপনটির মৌখিক ও শারিরীক রকরত দেখায়। মৌয়ের ছেলে বাপ্পী, কাজের বুয়া শহর বানু তা দেখে হিল হিল করে হাসে। এতে মর্জিনা খুব মজা পায়। মৌ ও এতদিন মর্জিনার সবকিছুকে স্নেহের চোখে দেখেছে। কিন্তু আজ কেন জানি মর্জিনার উপর ওর ভীষণ বিরক্তি লাগে। অথচ মর্জিনাকে ডেকে বকাঝকা করতে বা ধমক দিতে ও ইচ্ছে করছে না। মৌ টিভিতে একজনকে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে শুনল, মাদকাশক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দানের পাশাপাশি জীবন সম্পর্কে ও তাকে সচেতন করে তোলতে হবে। এ পৃথিবীতে ইচ্ছে করলে সে ও যে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে—এ উপলব্ধিটা তার বাঝে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তির আপনজনদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ন।

মৌ কি সফির জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে? না, সে পারেনি। তার কি—ই বা করার ছিল? আর কেনই বা সে করবে? বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম বর্ষের সেই আবেগঘন দিনে শরমের ভাঁজ ভেঙ্গে এক টুকরো কাগজে "প্রজাপতি" লিখে—সফির হাতে গুঁজে দিয়ে মৌ যে ভালবাসার চারাটি রোপন করেছিল—সফি কি শেষ পর্যন্ত এর কোন মর্যাদা রক্ষা করেছিল? না, সে রক্ষা করেনি। বরং মৌয়ের মায়ের সামান্য মেয়েলী অনুরোধে সে আযাদকে মৌয়ের জীবনে একটা পাকা রাস্তা তৈরী করার ব্যবস্থা করে দিয়ে কাপুরুষের মত ওর জীবন থেকে সরে দাড়িয়েছিল।

যুক্তির কষ্টি পাথরে মৌ বার বার মরহুম সফিকে আসামীর কাঠ গড়ায় দাড় করিয়ে দেয়। তবু এ অবি—মিষ্যকারীর জন্য তার চোখের কোনে আজ অনেক মেঘ। মৌ বিয়ের পর পরই আযাদের সাথে পশ্চিম জার্মানীতে চলে গিয়েছিল। দেশে ফেরার পর সেদিন রাত্রে ওর বান্ধবী রিনি ফোনে বলেছিল—

মৌ. আজ বিকেলে একুশে বই মেলায় তোর সে—ই প্রজাপতির সাথে কথা হলো,

মৌ হাসতে হাসতে বলেছিল,—

আমার আবার প্রজাপতি কেরে?

—আ—হা—রে আমার ছোট্ট খুকি। যেন আকাশ থেকে পড়লে?

এক সময় যার জন্য অজ্ঞান ছিলে।

—ও, তুই সফির কথা বলছিলে?

—জ্বি, মিসেস আযাদ, আমি সফির কথাই বলছি। বেচারা সফির যে এখন কি করুণ অবস্থা। সর্বনাশা ড্রাগ ওকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। অত্যন্ত মলিন প্যান্ট শার্ট, পায়ে ছেঁড়া স্যান্ডেল, চিরুনী বিহীন এক মাথা চুল, অযত্নে লালিত দাড়ী—গোঁফ, হাতে ফিল্টারবিহীন সিগারেট—এ বেশে সফিকে দেখে আমি তা আঁতকেই উঠেছিলাম।

রিনির মুখে সফির হালচালের বর্ণনা শুনে তার দুটি চোখ কেন জানি সেদিন ক্ষণিকের জন্য ছলছল্ করে উঠেছিল। সে ব্যস্ত হয়ে রিনিকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

—আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করল?

—সরাসরি জিজ্ঞাসা করেনি—তবে তোর ফোন নম্বরটা আমার কাছে থেকে নিয়েছে।

আজ মৌয়ের নিকট বিষয়টি স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় পরিষ্কার যে, সফি তার জীবনের শেষ দুঃসংবাদটি মৌয়ের নিকট জানানোর ব্যবস্থা করে যাবার জন্যই সেদিন রিনির নিকট থেকে ওর টেলিফোন নম্বরটা নিয়েছিল। মৌয়ের কেবলই—মনে হতে লাগল, মানুষের মন বড় বিচিত্র জিনিস। আর সময়, সময়ের মত বড় রংবাজ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। সময় সব কিছুকে তছনছ করে দিতে পারে। যেমন দিয়েছে সফির জীবনকে। প্রায় ছফুট লম্বা, উজ্জ্বল গৌর বর্ণের একহারা চেহারার সুদর্শন, মেধাবী সফি আহম্মেদ সফি—যে এক সময়, বন্ধুদের আড্ডায়, ডিপার্টমেন্টের সেমিনার, শীতকালীন বনভোজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট ম্যাচ, সাংস্কৃতিক অঙ্গন সর্বত্র ছিল এক প্রাণোচ্ছল টগবগে তরুন—যাকে বড়লোকের স্মার্ট মেয়ে রিনি দুষ্টুমি করে হিরু "হিরু" বলে ক্ষেপাত—সময় তাকে আজ কোথায় নিয়ে এসেছে।

মৌয়ের আরো মনে হল, এ—পৃথিবীতে সময় শুধু অদ্বিতীয় রংবাজই নয়— অদ্বিতীয় ছিনাল ও বটে। তার একই অঙ্গে অনেক রূপ। তাই কাজকের সকালের সাথে আজকের বিকেল—সন্ধ্যা—রাত্রের কতইনা পার্থক্য। আজকের সকাল—যা গত রাত্রের গর্ভ থেকে একটা কচি লাল সুর্যের মুখ নিয়ে পৃথিবীর সামনে হাজির হয়েছিল সেটা কি তার জন্য খুব খারাপ ছিল?—না, আনন্দভরা মনেই সে ঘুম থেকে উঠেছিল। ঘুম ভাংগা চোখে সে আযাদকে ওর প্রাতঃকালীন ক্রিয়াদি করতে দেখেছিল। আযাদ ওর স্বামী। আজ সাত বছর যাবৎ সে ওর ভার বইছে। বাকী জীবনটার ও নিশ্চয়ই বইবে। মৌয়ের সারা জীবনের দায়িত্ব—ভারটাই যে সে নিয়েছে। মাত্র সাত বছরের এ বিবাহিত জীবনে মৌকে সে বাপ্পী, এশাকে উপহার দিয়েছে। বাড়ী, গাড়ী, চালক, বাকর, গহনা কসমিটিসের ঐশ্বর্যে—আযাদ ওর জীবনকে কাণায় কাণায় পূর্ণ করে দিয়েছে। ওদের সুখের জন্য আযাদ ভীষণ খাটে। লোকটার জন্য মৌয়ের খুব মায়া লাগে। পাঁচ বছরের বাপ্পী চোখ বচলাতে কচলাতে বলেছিল—আম্মু আমার জন্য ঈদের জামা কিনতে মার্কেটে যাবেনা?

বাপ্পীর পিছু পিছু এশা ও এসেছিল। ছোট মনি এশা ভাংগা ভাংগা শব্দে বলেছিল, —আম্মি, আম্মি, আমাকে ভাইয়ার মত কেড্স কিনে দিবেনা? মৌ উচ্ছসিত আনন্দে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বলেছিল,

—আমার বোকা লক্ষী মেয়ে। মেয়েরা কি কিড্স্ পড়ে? তোমাকে লাল টুকটুকু মেয়েদের জুতো কিনে দিব।

স্বামী—সন্তানদের জন্য ঈদের পোষাক পরিচ্ছদ কিনে আনন্দ ভরা মন দিয়েই মৌ বাসায় ফিরেছিল। টেলিফোনট ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠলে মৌ রিসিভার উঠায়। ভেবেছিল—আযাদ হবে। আজ ওর অফিস ছিলনা। তুব কি প্রয়োজনে যেন অফিসে গিয়েছিল। আযাদ ইদানিং খুব ছেলে মানুষী করে। ওদের বিয়ে যে সাত বছর গত হয়েছে—এটা সে আজকাল একদম বিশ্বাস করতে চায় না। তাই ওর ভীষণ ব্যস্ততার মাঝে সামান্য সময় পেলে সেটা এখন সে মৌয়ের সাথে আলাপের জন্য বরাদ্দ করে রাখে। আজকের বিকেলের টেলিফোনটা আযাদের ছিল না। সে—ই টেলিফোনেই সিষ্টারের মুখ থেকে মৌ সফির মৃত্যু সংবাদ এবং সফির অন্তিম ইচ্ছার কথাগুলো জানতে পেরেছিল। তখন তার কেবল—ই মনে হয়েছিল।, সফি তার পরিচিত পরিমন্ডলের সকলের উপরেই একটা মহা অভিমান করে চলে গেছে।—এ চলে যাওয়া—চির দিনের মত চলে যাওয়া।—এ চলে যাওয়ার পর আর কেউ ফিরে আসে না। সফি ও আর ফিরে আসবে না।—তাই মৌ বিলম্ব করে নি। বেড়িয়ে পড়েছিল। খুঁজ খবর নিয়ে মৌ যখন আজিমপুর গোরস্থানে পৌছল— সফিকে তখন চির নিদ্রায় শয়নের শেষ আয়োজন চলছিল। মৌ একবার, শুধু একবার কফিন খুলে সফির মুখটি শেষ বারের মত দেখেছিল।

আগামীকাল ঈদ। অত্যাসন্ন/ঈদের আনন্দে সারা

মহানগরী মেতে উঠেছে। ছোট ছেলেমেয়েরা আতশবাজি ফুটিয়ে আগামী কালের ঈদকে অগ্রীম মোবারকবাদ জানাচ্ছে। ঈদের চাঁদ দেখার পর থেকে বাপ্পী, এশা ও খুশীতে লাফা—লাফি করছিল। মায়ের কাছে এসে বায়না ধরেছিল—ছাদে গিয়ে আতশবাজি ফুটাবে বলে। মৌ ওদের ধমক দিলে ওরা চুপ মেরে গিয়েছিল। আযাদও আজ কাল সকাল ফিরেছে। সে ঘরে ঢুকতেই বাপ্পী, এশা অনুযোগের সুরে বলে উঠল,

—আব্বু, আব্বু আম্মু টা যে কি, ঈদের আনন্দটা সে একটু ও বুঝেনা।

আযাদ হাসতে হাসতে ওদের দুজনকে দু'বগলে করে বেড রুমে ঢুকে। মৌকে এভাবে মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখে বাপ্পী, এশাকে কোল থেকে নামিয়ে সে মৌয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

—তোমার কি হয়েছে মৌ? শরীর খারাপ করেছে? দেখি, বলে আযাদ মৌয়ের কপালে হাত রাখে।

—না, টেম্পারেচার তো ঠিক আছে। মৌ, তোমার কি মাথা ধরেছে? ডাক্তার ডাকবো? মৌ বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলে উঠে।

—প্লিজ আযাদ, আমার কিছু হয়নি। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

মৌ আজ আযাদের সংগে এভাবে কথা বলছে কেন? সে তো ওকে এভাবে কথা বলে না। তবে হঠাৎ করে আজ মৌ এভাবে বদলে গেল কেন? মৌয়ের ভরা মৌসুম আজ হঠাৎ করে—ই এভাবে ফুরিয়ে গেল কেন?

আযাদ কিছুই বুঝতে পারছে না। টেলিফোনটা বেজে উঠে। মৌ চমকে সেদিকে তাকায়। আযাদ রিসিভার উঠায়। ভেলা, মৌয়ের ছোট বোন, আযাদ যাকে ঠাট্টা করে "ঝড়ের পাখী" বলে ডাকে—আজিমপুর থেকে টেলিফোন করেছে। শালী—দুলা ভাইয়ের হালকা আলাপের পর—আযাদ রিসিভারটা মৌয়ের দিকে এগিয়ে দেয়।

—কিরে আশা, আজ নাকি তোর মন ভাল নেই? কি হয়েছে? দুলা ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করেছিস? দেখ্ আপা, নৈশ্য কালীন ঝগড়া—টগড়া আমার একদম ভাল লাগেনা।

মৌ কোন জবাব দেয় না। ভেলা বলতে থাকে—

—শোন্ আপা, আমরা ঈদের পরদিনই আজিমপুরের ফ্লাট বাসাটা ছেড়ে দিয়ে ডোরী আঙ্গুরী লেনে নতুন বাসায় চলে যাচ্ছি।

মৌ এবার ব্যস্ত হয়ে বলে উঠে,

—কেন রে?

—আমাদের ৫ তলার ফ্লাট থেকে আজিমপুর কবরস্থানের সবকিছু দেখা যায়। আমাদের সাজন, লাশের সাদা কফিন বইয়ে আনতে দেখে প্রায়ই, আম্মু, আম্মু, মরা মানুষ, মরা মানুষ, বলে ভয়ে চিৎকার করতে করতে বরান্দা থেকে ঘরে ঢুকে।

মৌ আর কোন কথা বলে না। ভেলা তখন ও হাসতে হাসতে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলতে থাকে

—কিরে আপা, চুপ মেরে গেলে যে? সাদা কফিন, মরা মানুষের কথা শুনে মনে হয় ভয় পেয়েছিস। তুই যা ভীত না? তোর এ—এই ভীতুরে স্বভাবের কথা শুনলে আমাদের সাজন ও হাসবে।

মৌ আস্তে করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে আযাদ অবাক বিস্ময় সেদিকে তাকিয়ে থাকে। মৌয়ের সেদিকে একটুও খেয়াল নেই। ওর চোখে জল, জলের ধারা। তার অশ্রুসিক্ত চোখে কেবল ভেসে উঠে কফিনে ঢাকা সেই মুখ, কফিনে ঢাকা—সেই "প্রজাপতি।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকারে

* জনাব আবদুল কাদির ভূইয়া (নিন্দু)
প্রাক্তন ছাত্র

* জনাব মোশারফ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি. ডি. বি. নরসিংদী।

* জনাব আতাউর রহমান ভূইয়া
অধ্যক্ষ, পোড়াদিয়া ওয়াসিম উদ্দীন খান ডিগ্রী কলেজ, প্রাক্তন ছাত্র

* জনাব শওকত আলী ভূইয়া
প্রাক্তন ছাত্র

* স্কুল কমিটির সদস্যবৃন্দ ও স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ

* মনিরুজ্জামান ভূইয়া
চেয়ারম্যান, পাটুলী ইউঃ পরিষদ প্রাক্তন ছাত্র

* জনাব গিয়াস উদ্দীন ভূইয়া মলাই
প্রাক্তন ছাত্র

* এমদাদুল মজিদ হিরু (এম.এ)
প্রাক্তন ছাত্র

* মৌলানা আলী হোসেন
প্রাঃ হেড মৌলানা

* জনাব কুদরদ আলী (ক্যাপটেন)
প্রাক্তন ছাত্র

* জনাব মমরুজ আলী খান
প্রাক্তন ছাত্র

* আবু তাহের
সহকারী শিক্ষা অফিসার, প্রাক্তন ছাত্র

* শাহাদাৎ হোসেন
প্রাক্তন ছাত্র

*সামসুল হক, প্রাক্তন ছাত্র

* মোশারফ হোসেন (ব্যবসায়ী)
প্রাক্তন ছাত্র

* আফজাল হোসেন ভূইয়া
প্রাক্তন ছাত্র

নরসিংদী জেলার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে
'হীরক' জয়ন্তী সফল হউক।

B & H TRAVELS LTD.

Biman Approved Traveled Agent
Ticketing Travels & Tourguide etc.

আপনাদের সন্তোষ্টিই আমাদের মূলধন।

Head Office : Moon Mansion
12, Dilkusha Commercial Area,
Dhaka, Bangladesh,
Telepohne : 239728, 241508, 230608
Cable : BANDHPRISE

আলম এন্ড কোম্পানীর (হোমিও) চিকিৎসায় আমরা হাঁপানী ও মেদ-ভূঁড়ি হতে মুক্তি পেয়েছি

হাঁপানী হতে মুক্তি

আমি দীর্ঘ ১২/১৩ বৎসর হতে হাঁপানী রোগে ভুগে দেশের বড় বড় খ্যাতনামা ডাক্তার, কবিরাজ দেখিয়ে বহু অর্থ ব্যয় করে কোন ফল না পেয়ে হতাশায় ভুগতেছিলাম। যখন শ্বাস-কষ্ট বেশি হতো, তখন মনে হতো শীঘ্রই জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। এই কঠিন মূহুর্তে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে আলম এন্ড কোম্পানীর ডাক্তারের কাছে যাই জীবনের শেষ চিকিৎসা মনে করে। প্রথমে ডাক্তার সাহেব আমাকে ১০ দিনের ঔষুধ দেন। এই ঔষুধ সেবনের ৫/৭ দিনের মধ্যে হাঁপানীর টান ক্রমশঃ কমতে শুরু করলো।

এইভাবে নিয়মিত মোট ৪/৫ মাস ঔষুধ সেবণ করে আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি বর্তমানে আরোগ্য লাভ করে হাঁপানী থেকে ইনশাল্লাহ মুক্তি পেয়েছি। আমি আল্লাহর নিকট ডাক্তারদের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

মোঃ ইউসুফ আলী মিলন মিয়া
বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল
টংগী, গাজীপুর।

চিকিৎসা কেন্দ্রের ঠিকানা

আলম এন্ড কোম্পানী

আদর্শ হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র, হোমিও ঔষধ আমদানীকারক, সুলভে বিক্রেতা

ঢাকা শাখা ঃ ❑ ২, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩, ফোন-২৫৪১৪৩
❑ ৩১১, গভঃ নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫, ফোন-৫০৯০৯৯

নরসিংদী শাখা ঃ ❑ গ্রীন সুপার মার্কেট, স্টেশন রোড, নরসিংদী।

প্রাক্তন ছাত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'হীরক জয়ন্তী" উদ্‌যাপনকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

সৌজন্যে ঃ-

মেসার্স ব্রাদার্স এন্টারপ্রাইজ

৮৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোন ঃ ৮৬৩১২৭ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩১২৭
প্রোঃ আঁখি ভূষণ ভৌমিক

ফ্যাক্স ও কম্পিউটারের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।

YOUR TRUSTED TRADING HOUSE

BRIDGING BANGLADESH WITH OUTSIDE WORLD

Shimex *a reputed & reliable supplier of* ***fabric, yarn, accessories & machineries*** *of Hong Kong, China, Taiwan, Japan, Indonesia & Korea Origin, Sourcing directly from the manufacturers.*

Also buying ***Readymade Garment & Sweaters*** *from Bangladesh for U. S. A. & Europeans Market.*

On time delivery guaranteed.
Inspection by Buyer/International Inspection Agencies welcome.

SHIMEX LIMITED

Hong Kong Office: Room 1111, 11/F, Tung Ying Bldg.
100 Nathan Road, T. S. T., Kowloon, Hong Kong.
Phone: 367191, 3682056 **Fax:** 3682207, 5506490 **TLX:** 48052 SHIMX HX

Dhaka Office: 1/F Malek Mansion, 128 Motijheel C/A, Dhaka, Bangladesh
Phone: (o2) 247667, 247390 Fax" 863127.

আমাদের
এখন যা প্রয়োজন

- শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাঁটি ও টাটকা দুধ
- সবল ও সুস্থ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্যে পর্যাপ্ত আমিষ
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নতুন কর্মসংস্থান

গবাদি পশুর ছোট ছোট খামার, হাঁস–মুরগী পালন এবং মাছ চাষের মাধ্যমে এ সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব। এ কাজে সোনালী ব্যাংক সারাদেশে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করছে।

যার সুযোগ আছে এবং যিনি এসব কর্মকাণ্ডে উৎসাহী, তিনি প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণের জন্যে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহে যোগাযোগ করতে পারেন।

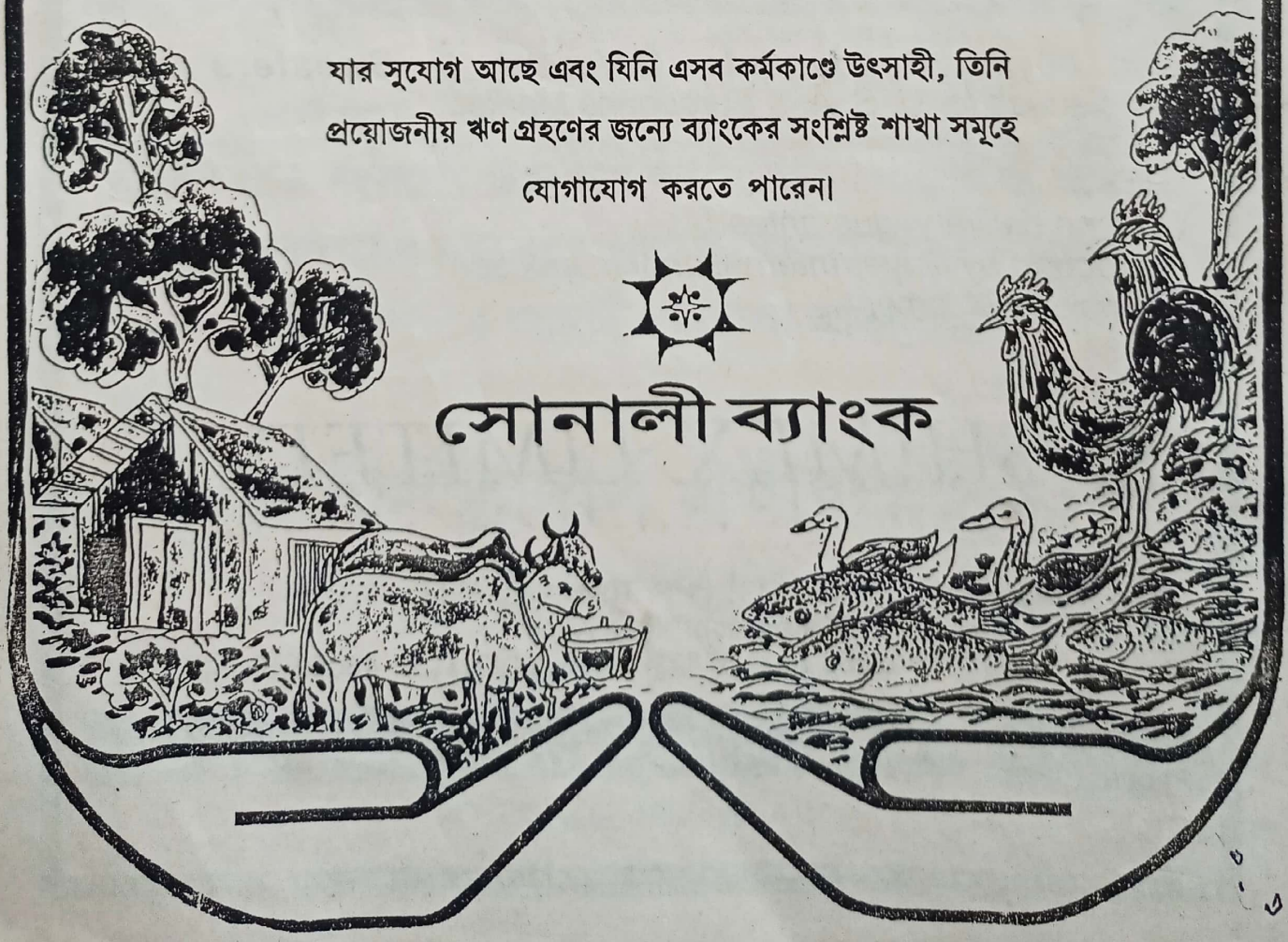

সোনালী ব্যাংক

পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী/'৯৪ সফল হউক।

বুক ডিপো

স্কুল, কলেজের যাবতীয় পাঠ্য বই ও গাইড বই পাওয়া যায়।
লাইব্রেরী পট্টি বাজীর মোড়, নরসিংদী।
প্রো ঃ মোঃ জসিম উদ্দীন ভূইয়া

বুক মাট

স্কুল কলেজের পাঠ্যবই ও গাইড পাওয়া যায়।
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
লাইব্রেরী পট্টি ৪ বাজীর মোড়, নরসিংদী
মোঃ হালিম মিয়া

শাহীন লাইব্রেরী

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
স্কুল কলেজের যাবতীয় বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হয়।
প্রোঃ গোলাম কবির বিলাল

রনী প্রিন্টিং

সর্ব প্রকার ছাপার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
বাজীর মোড়, নরসিংদী
প্রো ঃ মোঃকাইয়ুম মিয়া

ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে

পোড়াদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আব্দুল হামিদ ভূইয়ার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

বিদেশ হইতে দুগ্ধজাতীয় শিশু খাদ্যের আমদানী বন্ধ করার লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বাড়ান দেশকে পুষ্টিতে ভরপুর করে তুলুন। এবং মাছ মাংস ও ডিমের চাহিদা মিটাইয়া প্রোটিন ও পুষ্টির অভাব দূর করার জন্য এগিয়ে আসুন। দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলুন এবং ইহাকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিন। বেকারত্বের অভিশাপকে দূর করুণ। আজই নিম্ন ঠিকানায় খোঁজ নিন।

মডার্ণ ডেয়ারী কমপ্লেক্স

মালিকঃ মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন বাতেন

বিসিকের পূর্বে ভরতের কান্দির উত্তরপাশে দুগ্ধ, মৎস ও হাঁসমুরগীর খামার।

থানাঃ শিবপুর, নরসিংদী।

ষাট বৎসর পূর্তি উদযাপনে "হীরক জয়ন্তী/৯৪ উপলক্ষে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই সমস্ত ক্ষণজন্মা পুরুষদের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে গড়ে উঠেছিল একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাঁরা অজ্ঞানতার অন্ধকারকে মুছে দিয়ে শিক্ষার আলো জ্বেলেছিল। আমরা তাদের কাছে চিরঋণী ও চির কৃতজ্ঞ। পোড়াদিয়া প্রাক্তন ছাত্র সংসদ একটি সংকলনের মাধ্যমে এই ঋণ শোধ করার প্রয়াস চালাচ্ছে বলে সংসদের সকল সদস্যদের জানাই প্রাণ ঢালা অভিনন্দন।

প্রগতি ডেয়ারী ফার্ম

মালিকঃ এম, এস, ভুইয়া

(একটি আদর্শ দুগ্ধ খামার)

গ্রামঃ দাস পাড়া, নরসিংদী।

Bangladesh's No.1 insures your risk

Only General Insurance Corporation in the nationalised sector

SADHARAN BIMA CORPORATION

The Symbol of Economic Security.

33, Dilkusha Commercial Area, Dhaka, Bangladesh.

আই সি বি ইউনিট ফান্ড

একটি বিশ্বস্ত ও লাভজনক বিনিয়োগ মাধ্যম

- ইউনিট সার্টিফিকেট সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটি।
- অর্থ আইন ১৯৯৩ অনুসারে ৫,০০০·০০ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন করা হয় না।
- কর আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে ইউনিট সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ করে বিনিয়োগ ভাতা এবং ওয়েলথট্যাক্স মওকুফের সুবিধা গ্রহণ করা যায়।
- ইউনিট সার্টিফিকেট সহজে কেনা ও ভাংগানো যায়।
- বিনিয়োগের নিরাপত্তা, পুঁজির প্রবৃদ্ধি ও নিয়মিত আয়ের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে আই সি বি ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয় করুণ এবং দেশের শিল্পায়ণে সহযোগিতা করুণ।

১৯৯২–৯৩ অর্থ বছরে প্রদত্ত লভ্যাংশের পরিমাণ ইউনিট প্রতি ১৭.০০ টাকা

ইউনিট সার্টিফিকেট দেশের সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদানকারী সিকিউরিটি গুলোর অন্যতম

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

শিল্প ব্যাংক ভবন, ৮, ডি আই টি এ্যাভিনিউ
ঢাকা। ফোনঃ ২৪০৯০০